বাংলা
পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিকা

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী



কমল পাবলিকেশনস্
পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭০০০০৯।

VAMLA

PATHA SAHITYA : PATHA PUSTIKA

[Bengali Street Literature : Street Booklets]

By Dr J Goswami

First Published October 1982

প্রকাশক : শ্রীপরেশচন্দ্র সাঁতরা
কমল পাবলিকেশনস্
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, মহালয়া ১৩৮৯
অক্টোবর ১৯৮২

গ্রন্থের রচনাকাল : ১৯৭০ (জুলাই-আগস্ট)

মুদ্রক : লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে যিনি আমার মনের খুব কাছাকাছি,

সেই গবেষক ও সাংবাদিক—

শ্রীযুক্ত নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)

প্রীতিভাজনেষু

ভূমিকা

মানুষের কোনো সৃষ্টিই ব্যর্থ নয়। 'সাহিত্যের আগাছা' নামে পরিচিত পথ-সাহিত্যের লেখকবর্গ তাঁদের সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা অনুভব করেছেন, যে সৃষ্টি তাঁরা দিয়ে গেছেন, তা ব্যর্থ নয়। সমাজের একটি বিরাট অংশ পথ-সাহিত্য থেকেই পেয়েছে আনন্দ, উত্তেজনা অনেক কিছুই। 'বাংলা পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিকা' বিরাট কোনো গবেষণা গ্রন্থ নয়। অনাগত গবেষকদের কাছে এই ধারাটি সম্পর্কে শুধু একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা প্রায় সবই হারিয়ে গেছে। এ দেশের কয়েকটি পাঠাগারে দু-চারটি থাকলেও থাকতে পারে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ক্যাটালগে কিছু নাম দেখেছিলাম; যদি সেগুলির অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো কাজে কিছু সহায়তা করবে। লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগ বা বেঙ্গল লাইব্রেরী অফিসের ক্যাটালগ কিছু নামের স্মৃতি বহন করছে।

এখনো পথ-সাহিত্য জাতীয় অনেক রচনা প্রকাশ পাচ্ছে। অনেক পথ-পুস্তিকাও যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে। মুদ্রিত রচনাগুলি একত্র বাঁধিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। সাহিত্য মূল্য এগুলির যা-ই থাক না কেন, এক একটি 'অভিজাত' সাহিত্য রচনার সমাজগত প্রস্তুতির ইতিহাস হয়তো এগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। জনতা-মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও এগুলির দান কম নয়।

উনিশ শতাব্দীতে লেখা পথ-পুস্তিকার তালিকা দিলাম। গবেষক মহল থেকে এগুলি যাতে নির্বাসিত না হয়—শুধু এই উদ্দেশ্যে। অনেক পথ-পুস্তিকা-কল্প গ্রন্থ ও অতি ক্ষীণায়তন গ্রন্থের তালিকাও পরিশিষ্টে আনুষঙ্গিক হিসেবে দিলাম। কারণ আমি মনে করিনে—পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিকার চরিত্র সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। অতি ক্ষীণায়তন অন্য ধরনের কিছু বইয়ের নামও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলো পরিশিষ্টে।

পূজনীয় আচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভটাচার্যকে আমার প্রণাম জানাই। সাধারণ মানুষকে নিয়ে ভাববার প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই আমি লাভ করেছি। পরিশেষে প্রকাশক-বন্ধু শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সাঁতরার সহৃদয়তার কথা স্বীকার করি। তাঁর উৎসাহেই এই বইটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছি।

বিনীত

বাগনান — জয়ন্ত গোস্বামী

রথযাত্রা, ১৩৮৯

বিষয়-সূচী

গ্রন্থকারের দৃষ্টিকোণ

* পৃথিবীর কোনো মানুষের সৃষ্টিই অবহেলার নয়। অবহেলা মানে মানবতাকেই অবহেলা করা।
* সমাজের আলো দেখতে হলে অন্ধকারকেও দেখতে হবে।
* এক একটি Personality-র উদ্ভবের জন্য 'আবর্জনার' মধ্যে প্রস্তুতি চলে।
* পৃথিবীর নগণ্যতম মানুষও সামগ্রিক মানবধারার ভাবজগৎ চিন্তাজগৎ ও কর্মজগতের সম্মানিত অংশীদার।

পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিকা

'Street Literature' নামে একটি ইংরেজী শব্দ প্রচলিত আছে। বাংলায় তারই আক্ষরিক অনুবাদ 'পথ-সাহিত্য'। 'Literature' শব্দটির অর্থ ইংরিজী ভাষায় অনেকটা ব্যাপক। কোনো বিশেষ পণ্য দ্রব্য সম্পর্কিত কিছু বিস্তৃত বক্তব্য সমেত লিফ্‌লেট্‌ও লিটারেচার। বাংলায় তাকে 'সাহিত্য' বললে আবার হাস্যকর শোনাবে। কারণ 'সাহিত্য' বললেই আমাদের মনের মধ্যে জাগে অনুভূতির কথা—ভাব রস ইত্যাদি নানান কথা। তাই বাংলা নামকরণে কিছুটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। তবু বৈকল্পিক নাম দেবার কোনো উপায় না থাকায় এই নামটিই গ্রহণ করা হলো। আমরা ইংরেজী সমালোচনার জগৎ থেকে অনেক শব্দই এনে ধুতি চাদর পরিয়েছি।

Street Literature নামটির মধ্যে কিছু বক্তব্য প্রচ্ছন্ন আছে। একদিকে আছে গ্রামীণ আসরের সাহিত্য। সেখানে আসরের মধ্যে সাহিত্য সুরে গীত হয়। অন্যদিকে আছে অভিজাত সাহিত্য—যা পুস্তক আকারে বইয়ের দোকানে বিক্রী হয়। Street Literature-এ দুটির কোনোটিই নয়। অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে এগুলির এইটুকুই মিল যে এগুলি হরফ-নির্ভর। শহরের পাকা বাড়ীর দেয়ালে আলকাতরা বা কালিতে লেখা রাজনৈতিক পদ্য, বিয়ের আসরে বিনামূল্যে বিতরিত বিয়ের পদ্য, পোষ্টারে হাতে-লেখা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ের পদ্য, হ্যাণ্ডবিল আকারে (বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে) বিভিন্ন জমায়েতে বিতরিত সাহিত্য—সব কিছুই পথ-সাহিত্যের মধ্যেই পড়ে। 'পথ-পুস্তিকা' নামে যার উল্লেখ করতে চাই, তা পথ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। এগুলি বইয়ের দোকানে বিক্রী হয় না। রাস্তায় বা জমায়েতে এগুলি বিলি করা হয়, অথবা হকারের মাধ্যমে বিক্রী করা হয়। বিশেষণ হিসেবে 'Street' শব্দটির প্রয়োগের মধ্যে অবশ্য অভিজাত সমালোচক-মহলের উন্নাসিক দৃষ্টি উপলব্ধি করা যায়।

ইতিমধ্যে বাংলা সমালোচনার জগতে আমরা অবশ্য গণ-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য—ইত্যাদি বিভিন্ন নামকরণ প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে পথ-সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই পৃথক নামকরণেরও সার্থকতা আছে।

পথ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে নাগরিক বা আধা-নাগরিক সংস্কৃতি থেকে। লোক সাহিত্য গ্রামীণ সংস্কৃতি-নির্ভর। সুতরাং এই দিক থেকে লোক-সাহিত্যের সঙ্গে পথ-সাহিত্য পার্থক্য রক্ষা করছে।

পথ-সাহিত্য হরফ-নির্ভর। সুতরাং লোক-সাহিত্যে নিরক্ষরদের প্রবেশাধিকার থাকলেও পথ-সাহিত্যে তাদের সহজ প্রবেশাধিকার নেই। 'সহজ' কথাটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে, অনেক সময় দু'চারজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে কাছে বসিয়ে কোনো সাক্ষর ব্যক্তি পথ-সাহিত্যের অন্তর্গত পথ-পুস্তিকা পড়িয়ে শোনাতে পারেন। সেগুলিকে ঠিক আসর বলা যায় না। শুধু হরফ-নির্ভর নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথ-সাহিত্য মুদ্রণ-নির্ভর। নগরাঞ্চল গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সাক্ষরতায় অগ্রসর। তাই নগরাঞ্চলের আওতায় রচিত পথ-সাহিত্য আসর-নির্ভর না হয়ে হরফ-নির্ভর বা মুদ্রণ-নির্ভর হয়েছে। অবশ্য মুদ্রিত পথ-সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে জন-সাহিত্য বা লোক-সাহিত্যের মতো মজলিশী। নিম্নশ্রেণীর মজলিশে পঠনীয় রচনা হিসেবে বিশেষ করে পথ-পুস্তিকার একটি প্রধান মূল্য থাকলেও ব্যক্তিগত অবকাশেও সেগুলি পঠনীয়। লোকসাহিত্যের সঙ্গে এখানে তার পার্থক্য।

পথ-সাহিত্য আধুনিক যুগের ফসল। মধ্যযুগে সাহিত্য ছিলো আসর-নির্ভর। তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিলো না। তাই তখন ঠিক পথ-সাহিত্য ধরনের বস্তু গড়ে উঠতে পারেনি। পথ-পুস্তিকা—এবং হ্যাণ্ডবিল-সাহিত্য উনিশ শতাব্দী থেকে ব্যাপক আকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। বিশ শতাব্দীর সায়াহ্নেও পথ-পুস্তিকার আদর একটি বিশেষ সমাজের মধ্যে এখনো দেখি। পূর্বোক্ত বিশেষ সমাজ সঙ্কীর্ণ হতে পারে কিংবা প্রসারিত হতে পারে; কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্ভবতঃ কোনো যুগেই বিনষ্ট হবে না। সুতরাং এই জাতীয় সাহিত্য ভবিষ্যতেও না থাকার কোনো কারণ নেই।

আজকাল ফ্যাশন হিসেবে পথ-সাহিত্যের অবয়বে অভিজাত-সাহিত্য প্রচারের প্রবণতা দেখা যায়। সাহিত্যিক বা প্রকাশক নাকি সাহিত্যের সঙ্গে গণ-সংযোগ ঘটাতে চান। কিন্তু এঁরা কাগজ, ছাপা, ব্লক, গেট্ আপ্, লে-আউট—সব দিক থেকেই যেন জানাতে চান যে, তাঁরা Intellectual, পথ-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁদের কোনো সংযোগ নেই।

পথ-পুস্তিকাগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত এবং অনধিক এক ফর্মায় বই। অন্যান্য গ্রন্থের মতো পৃথক মোটা কভারে এর প্রচ্ছদ ছাপা হয় না। পৃষ্ঠা যে কাগজ, সাধারণতঃ সেই কাগজেই কভার ছাপা হয়। কভারই টাইট্ল্ পৃষ্ঠা এবং টাইট্ল্ পৃষ্ঠাই কভার। হয়তো বা কেউ কেউ রঙিন 'ঘুড়ির কাগজে' কভার করেন। কাগজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের। ছাপাখানার সদা-ব্যবহার্য নক্সার লাইন বা অতি ক্ষুদ্র ব্যবহার-মলিন ছবির ব্লক টাইট্ল্ পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে তাকে প্রসাধনে একটু 'সুন্দর' করবার চেষ্টা চলে। বইয়ের নাম ব্লকে হয় না। কারণ বইয়ে ব্লকের জন্য পৃথক খরচ নেই। রেডিমেড ব্লকে কাজ হয়। ছাপাখানার ঢাউস-মার্কা সেকেলে হরফগুলি অভিরুচি মতো সাজিয়ে বইয়ের নাম ছাপা হয়। ফুটপাথের পণ্যদ্রব্যের মতো এর একটা 'ফেলা দাম' বইয়ের কভার বা টাইট্ল্ পৃষ্ঠায় ছাপানো থাকে। 'ঘরের দামও' একটা থাকে বই কি। পরবর্তী কালের

পথ-পুস্তিকায় 'ফেলা-দামের' মতো 'ফেলা-ঠিকানা' এবং 'ঘরের ঠিকানা' (অমুদ্রিত) পাওয়া যায়।

বিষয় বস্তুর দিক থেকে পথ-পুস্তিকাগুলি সাধারণতঃ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়ে থাকে। কারণ এ-জাতীয় সাহিত্যের রসিক সমাজ যে পর্যায়ের সেখানে রক্ষণশীলদের সংখ্যাই বেশি। পুরোনো পারিবারিক নীতিগুলির ভিত্তিতে প্রচুর পথ-পুস্তিকা লেখা হয়ে আসছে। পুত্র বা কন্যা পিতা বা মাতাকে অবহেলা করছে, তার দৃষ্টান্ত বা আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অনেক পথ-পুস্তিকা রচিত হয়েছে। এর সঙ্গে মিশে রয়েছে পুরোনো পুরুষ-তান্ত্রিক মনোভাব। যেমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রৈণতা, শ্বশুরবাড়ী-প্রীতি থেকে আরম্ভ করে পুত্র-বধূর দুর্বিনয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিরুদ্ধে এইসব সাহিত্যের লেখকরা তাঁদের বিদ্রূপাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

শুধু রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই যে পথ-পুস্তিকা রচিত হয়েছে, তা নয়। বিভিন্ন হুজুগ নিয়েও অনেক পথ-পুস্তিকা রচিত হয়েছে দেখতে পাই। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু কিছু দৃষ্টি-আকর্ষক ঘটনা। অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগও পথ-পুস্তিকার ইন্ধন যুগিয়েছে। কিছু দৃষ্টি আকর্ষক অপরাধকে কেন্দ্র করে লেখা পথ-পুস্তিকা নিতান্ত কম লেখা হয়নি। এমন কি বিশেষ বিশেষ উৎসবের উত্তাপেও আগাছার মতো পথ-পুস্তিকা রচিত হয়েছে অনেক। মোট কথা রসিক সমাজের মনের উত্তাপটুকুই এই জাতীয় সাহিত্যের সম্বল। কারণ নিরুত্তাপ মনে উত্তাপ সৃষ্টি করবার তীব্র ক্ষমতা এগুলির মধ্যে তেমন নেই। পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ যে পর্যায়ের, সেখানে সাহিত্য থেকে তারা যেমন কিছু প্রত্যাশা করে না। তাই অর্ধশিক্ষিত অসাহিত্যিকের রচনাও এদের কাছে অনেক উপাদেয়।

পথ-সাহিত্যের অন্তর্গত পথ-পুস্তিকাগুলির মধ্যে অনেক সময়ে যৌন দিক থেকে কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্যি যে, অভিজাত সাহিত্যে বরং অনেক সময়ে যৌন দিক প্রকাশের সচেতন প্রবণতাই দেখা যায়। তবে সেখানে সভ্যতার গণ্ডী বজায় রেখে কতো বেশি পরিমাণে উপাদান দেওয়া যায় সেই চেষ্টা! কিন্তু পথ-পুস্তিকাগুলির মধ্যে ঠিক সেই ধরনের প্রবণতা নেই। পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজকে আমরা অতি সুরুচি সম্পন্ন বলে আশা করি না। তাই যৌনতার প্রতি শুচিবাতিকতার অভাব পথ-পুস্তিকার লেখক বা রসিক সমাজ—কোনো পক্ষেরই নিতান্ত কম ছিলো না এবং রচনা আস্বাদনের ক্ষেত্রেও বাধা ছিলো না। অবশ্য সব পথ-পুস্তিকার মধ্যেই যে যৌনতা আছে, একথা মনে করা অন্যায়।

পথ-পুস্তিকার সাহিত্য-রীতি এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য-রীতি। রীতির দিক থেকে এই সাহিত্যের লেখকরা অনেকখানি রক্ষণশীল। পুরোনো আমলের পয়ার-ত্রিপদীর কবিতায় বক্তব্য প্রকাশ করা এঁদের কাছে খুব প্রিয় জিনিস। কখনো কখনো বা নাট্য-

রীতিতে বা গল্প কাহিনী আকারেও কিছু রচনা দেখা যায়। পদ্যের তুলনায় এই জাতীয় রচনার সংখ্যা কম। অনেকে আবার পুস্তিকায় গল্প পদ্য নাটক কিছুই বাদ দেননি। অর্থাৎ একটি আট-দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় হয়তো সব রীতিরই কিছু কিছু প্রকাশ ঘটেছে।

এইসব পুস্তিকার মধ্যে Printing mistake কিংবা লেখকের অজ্ঞতা-প্রসূত বানান ভুল প্রত্যাশিত বিষয়। রসিক সমাজ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। মাঝে মাঝে শব্দের অপপ্রয়োগও লক্ষ্য করবার মতো।

সব শেষে বলা প্রয়োজন, পথ-পুস্তিকা যেহেতু পথ-সাহিত্যের অন্তর্গত, অতএব তাকে এক ফর্মার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। কারণ পথ-সাহিত্যের পুরোপুরি স্বভাব নিয়ে বিদ্যমান কিছু সামান্য পৃষ্টায়তন পুস্তিকাও বাজারে দেখা যায়। তবে সরকারী নথিলেখক বা বিদেশী সমালোচকদের কারো কারো মন্তব্য দেখে মনে হয়, তাঁরা এর একটা সীমা বেঁধে দিতে চান—অন্ততঃ আয়তনের দিক থেকে। এতে অবশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাহ্য দিক থেকে একটা সুবিধা হয়। আপাততঃ সেই পদ্ধতিকে না মেনেও অন্ততঃ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েই পথ-সাহিত্যের অন্তর্গত এই পথ-পুস্তিকাসমূহ। সমালোচকের জগতে এগুলি অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু মানুষের কোনো সৃষ্টি ব্যর্থ নয়। এইসব পথ-পুস্তিকার লেখকরা সমাজের একটি বিরাট অংশকে তৃপ্তি দিয়ে থাকে। অর্থ নৈতিক সংকটে এই সমাজ আসরের ব্যবস্থা করতে পারে না। শহর বা শহরতলীর এইসব মানুষ গ্রামের আসর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। অথচ অভিজাত সাহিত্যের দরজা এদের জন্য বন্ধ না হলেও এঁরা অভিজাত সাহিত্যের সম্মানিত পাঠক নন। অভিজাত সাহিত্য এঁদের মনে তেমন কোনো আবেদনও রাখতে পারে না। পথ-পুস্তিকাই এইসব মানুষের মনে আনন্দ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই জাতীয় পুস্তিকার প্রয়োজন যাঁরা অস্বীকার করবেন, তাঁরা সমাজের একটি বিরাট অংশকেই অস্বীকার করবেন। এগুলি হয়তো 'আগাছা সাহিত্য', 'জঞ্জাল সাহিত্য'। কিন্তু হয়তো এইসব 'আবর্জনার' মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাজের জীবন্ত চিত্র, জনতা-মনস্তত্ত্ব—হয়তো বা আরো কিছু। আগামীদিনের সংস্কার-মুক্ত উদার গবেষকদের পথ চেয়ে রয়েছেন বর্তমান গ্রন্থের লেখক।

পথ-পুস্তিকা এবং রসিক পরিবেশ

পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে শিক্ষিত পাঠকবর্গের উন্নাসিক দৃষ্টি রয়েছে। এই জাতীয় একটি পুস্তিকা ক্রয় করতে তাঁদের আত্মসম্মানে বাধে। কারণ পার্শ্ববর্তী অনেকের ধারণা হতে পারে যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিটির শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য রসাস্বাদনের মান ও রুচি নিম্নশ্রেণীর। অনেক সময় সময়-কাটাবার জন্য যদিও বা কেউ কেউ হয়তো কেনেন, কিন্তু পথ-সাহিত্যের রচনা যে মানের, সেই মান অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পাঠককে তেমন তৃপ্তি দিতে পারে না। তাছাড়া পথ-পুস্তিকা লেখকের দৃষ্টিকোণ উন্নাসিক পাঠকদের কাছে অনেকটাই হাস্যকর বলে মনে হয়।

অন্য দিকে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের রসিক সমাজ। এদের জন্য রয়েছে আসর-নির্ভর সাহিত্য। মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকার প্রতি গ্রামীণ ব্যক্তির আকর্ষণ কম। মুদ্রিত সাহিত্যের ব্যক্তিগত বা মজলিশী রসাস্বাদনে এদের তেমন রুচি নেই। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ নির্বিশেষে বই কেনবার অভ্যাসটা খুবই কম। পাঠ্য বই তাঁরা কেনেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু তার বাইরে বই কেনাকে অনেকেই বাজে খরচ বলে মনে করেন। এ-ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত বা প্রায় অশিক্ষিত ব্যক্তির বই কেনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শহরাঞ্চলে বা তার আশেপাশে বই কেনার অভ্যাস শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে রয়েছে। এমনও দেখা যায়, অশিক্ষিত ব্যক্তিও বই কিনে শিক্ষিত ব্যক্তি বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির সহায়তায় তার রসাস্বাদন করছে। অক্ষর জ্ঞান শহরাঞ্চলে খুবই প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বইয়ের যোগানও শহরাঞ্চলে আছে। পথ-পুস্তিকার যে রসিক সমাজ—তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক চাপ থাকা খুব স্বাভাবিক। এই চাপের মধ্যে তারা অল্প দামের বই কিনে থাকে। দামের দিক থেকে পথ-পুস্তিকা স্বল্প মূল্যের হওয়ায় পথ-পুস্তিকায় রসাস্বাদনে ঝোঁকটা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া বিষয়বস্তু ও রুচির দিক থেকেও অন্যান্য ধরনের বইয়ের তুলনায় পথ-পুস্তিকা এদের কাছে অনেকখানি আপনার। সুতরাং অভিজাত পাঠক এবং গ্রামাঞ্চলের লোক-সাহিত্যের রসিক সমাজের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ।

শহরাঞ্চলে গৃহভৃত্যদের মধ্যে পথ-পুস্তিকা পাঠে বর্তমানে অনেকখানি ঝোঁক দেখা যায়। তারা শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকে এবং গোছানোর খাতিরে অনেক বইও তাদের নাড়াচাড়া করতে হয়। যে বইগুলি নাড়াচাড়া করে, সেগুলি পড়বার সুযোগ

হয় না। অনেক সময় সেগুলি পড়বার সুযোগ পেলেও তা পড়বার মতো বুদ্ধি, রুচি বা মানসিকতা তাদের নেই। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিরও অবসর-সময় গ্রাম্য-রাজনীতিতে কাটে ; কিন্তু শহরাঞ্চলের গৃহভৃত্য তার অবসর সময়ে তার পান বিড়ির খরচা বাঁচিয়ে কেনা এক ফর্মার কোনো বই তার টিনের বাক্স থেকে বার করে পড়তে বসে—এমন দেখা যায়। কখনো বা পার্কে একসঙ্গে তিন চারজন গৃহভৃত্য জড়ো হয়। একজন পড়ে, আর সবাই শোনে। অনেক উড়িয়া রাঁধুনী ঠাকুরের বাক্সেও এমন বই থাকে। তারাও অবসর সময়ে একই ভাবে বইগুলির রসাস্বাদন করে। এই ধরনের বই পড়বার ঝোঁক তাদেরই বেশি, যাদের পুঁজি সামান্য অক্ষর জ্ঞান হলেও যারা শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে থাকে।

অন্য জাতীয় রসিক সমাজও রয়েছে। কারখানার শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী কিংবা এই গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তি। অবশ্য যারা এককভাবে বাস করে, তারা এই জাতীয় বই একটু বেশি কেনে।

সমাজের ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমরা যাঁদের বুঝি, যাঁরা বই পড়েন, ভালো জামা-কাপড় পরেন, ইস্কুল কলেজে অফিসে যান, তাঁদের জীবনযাত্রার প্রতি পূর্বোক্ত গোত্রের লোকদের একটা মোহ থাকে এবং এই জীবন ধারা তারা অনুকরণ করবার চেষ্টা করে—অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে যতোটা সম্ভব, ততোটা। পথ-পুস্তিকা ক্রয়ের প্রতি আগ্রহ সেই প্রবণতা থেকেই।

পথ-পুস্তিকার বিক্রেতাদের অনেকেই এই সমাজের অন্তর্গত। বিক্রীর স্বার্থে এবং আলাপ-পরিচয়ের স্বার্থে তারা পূর্বোক্ত রসিক সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। তাদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাও অনেকের এই ধরনের পুস্তিকা পাঠের রুচি তৈরি করে দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাবে পড়েও অনেকে এ ধরনের বই কিনে থাকে।

পথ-পুস্তিকা স্তরের বই কেনার বিষয়ে এদের নির্দিষ্ট কোনো বাজেট নেই। খেয়াল মতো এরা বই কেনে। তাই বিষয়ের আকর্ষণ দিয়েই এদের মধ্যে ঝোঁক সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলে।

একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে,—বর্তমান কালের পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ এবং উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজের মধ্যে চারিত্রিক কোনো পার্থক্য আছে কিনা। কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকবে, যেমন রয়েছে উনিশ শতাব্দী এবং বিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকাগুলির মধ্যে পার্থক্য। উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা তখনকার তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের মধ্যে কিছু কিছু মিশে গেছে। কারণ অভিজাত সাহিত্যিক বা পাঠক-সমাজ সে যুগে পথ-পুস্তিকার বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক সময় খুব বেশি রকম পার্থক্য রচনা করেনি। এক শতাব্দী পরেও পথ-পুস্তিকা তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে প্রায় একই রকম

থেকে গেছে। তার কারণ পরবর্তী কালের অভিজাত লেখক এবং অভিজাত পাঠক যেমন বিভিন্ন আদর্শকে অনুসরণ করে মান উন্নত করতে পেরেছেন তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির সহায়তায়, পথ-পুস্তিকার লেখক ও রসিক সমাজ তা করতে পারেননি। স্বল্প জ্ঞান, রসিক মনের প্রতি বৈতসিকতা ইত্যাদির জন্য লেখককে পুচ্ছানুগ্রাহিতায় সক্রিয় করেছে।

পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ অভিজাত সাহিত্যের লেখকের বই কখনো যে পড়ে না, তা নয়। কারণ অভিজাত সাহিত্যের পাঠকদের সঙ্গে পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজের যে পার্থক্যের সীমারেখা, তা অনেক সময় স্পষ্ট থাকে না। সীমারেখা-স্পর্শী একটি বিরাট রসিক সমাজের অংশ একই সঙ্গে পথ-পুস্তিকা এবং অভিজাত সাহিত্যের পাঠক। তবে পথ-পুস্তিকা পাঠের রুচি যাদের, অভিজাত সাহিত্যের বৃত্তে অবস্থানকারী পথ-পুস্তিকাধর্মী রচনার প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি। তবে এ-বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু ইঙ্গিত করা সম্ভবপর নয়। একথা শুধু বলা যেতে পারে যে, আর্থিক সুবিধা-অসুবিধা এই রসাস্বাদনের মানসিকতা অনেকটা নির্ধারণ করে। ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচির অপেক্ষাকৃত উন্নত মান পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজকে অভিজাত সাহিত্যের পাঠক শ্রেণীতে উন্নীত করেছে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

পথ-পুস্তিকা এবং লেখকের প্রবণতা

পথ-পুস্তিকার লেখক সমাজ এবং রসিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য বিরাট নয়। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে, পথ-পুস্তিকার লেখকদের মধ্যে অনেকে শিক্ষা-দীক্ষায় কিছু উন্নত। অবশ্য লেখকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগও রয়েছে।

অত্যন্ত ছোটোখাটো প্রেস, যাতে সাধারণতঃ জবের কাজ হয়, সেগুলির কোনো কোনো মালিক বড়ো প্রেসের অনুকরণে অল্প অর্থ লগ্নীতে দুই একটি বই ছাপতে চান। পরিচিত ব্যক্তিরাই এই সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রায় সর্ব-ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এগুলি কবিতা আকারে লেখা হয়। এজেন্টের মাধ্যমে বিরাট আকারে এগুলি বাজারে ছাড়া হয় না। ইমপ্রেশনও খুব বেশি হয় না। এগুলিতে ব্যবসায়িক লাভের তেমন একটা উদ্দেশ্য থাকে না। নিতান্তই এগুলি প্রেস মালিকের সখ বা খেয়াল বলা যায়।

অনেক সময় কোনো কোনো প্রেস-মালিক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই পথ-পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের স্পষ্ট নির্দেশ থাকে। এজেন্টের মাধ্যমে তাঁদের পথ-পুস্তিকা বাজারে ছাড়া হয়। পুস্তিকার লেখক একজন থাকেন বটে। তবে এমনও দেখা যায় যে, পারস্পরিক বোঝাবুঝির মধ্যে লেখক হিসেবে যে কোনো একজনের নাম দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য কোনো জাতীয় পথ-পুস্তিকা লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের লিখিত কোনো চুক্তি থাকে না।

আবার এমনও দেখা যায় যে, কোনো কোনো সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী লেখক নিজের খরচায় প্রেস থেকে কোনো বই ছাপেন। এঁরা সাধারণতঃ বড়ো প্রেসে যান না; ছোটো প্রেসে অল্প খরচায় অল্প সংখ্যায় বই ছাপেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বা চরিত্রের দিক থেকে এই ধরনের লেখকের বেশ কিছু বই পথ-পুস্তিকার আওতায় পড়ে।

অনেক সময় প্রেস-মালিকের উদারতায় প্রেস-কর্মচারীদের অনেকে ছাঁট কাগজ বা উদ্বৃত্ত কাগজ সংগ্রহ করে পথ-পুস্তিকা ছেপেছেন—এমনও দেখা যায়। এই জাতীয় পথ-পুস্তিকা—লেখকদের অনেকেই আছেন প্রেস-কর্মচারী।

পথ-পুস্তিকার লেখক-প্রবণতা আলোচনার পূর্বে মোটামুটিভাবে অলোচনায় দেখা গেল যে, পথ-পুস্তিকার লেখকবর্গ ঠিক একজাতীয় নন, অথবা একই জাতীয় পরিবেশে সাহিত্য রচনা করেন না। কোথাও থাকে নির্ধারিত বিষয়বস্তু সহ তাগিদ, কোথাও বা থাকে আধা-তাগিদ, আবার কোথাও কোথাও লেখকের লেখার ক্ষেত্রে মোটামুটি স্বাধীনতা

থাকে। অভিজাত পত্র-পত্রিকায় পথ-পুস্তিকা লেখকের কোনো রচনা প্রকাশের তেমন একটা সংবাদ পাওয়া যায় না—অন্ততঃ পরবর্তী যুগে।

পথ-পুস্তিকা লেখকের একটি প্রবণতা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হলো তাঁদের রচনা-প্রকাশক বা রসিক সমাজের প্রতি অতিরিক্ত বৈতসিকতা। তাঁদের ইচ্ছাকে লেখকরা বড়ো মূল্য দেন। অন্য কোনো পথ-পুস্তিকার মোটামুটি বাজার লক্ষ্য করে প্রকাশক তারই অনুকরণে অথবা সেই পুস্তিকার ভাষা সামান্য অদল-বদল করে পথ-পুস্তিকা রচনার যদি নির্দেশ দেন, লেখক সেই নির্দেশও অম্লানবদনে পালন করেন। প্রকাশকের নির্ধারিত বিষয়বস্তু হুবহু অনুসরণ করা হয়। সেখানে অবশ্য ভাষাগত কিছু স্বাধীনতা থাকে। অনেক সময় প্রকাশক অভিজাত লেখকদের দ্বারা রচনা সংশোধন করিয়ে নেন। পুস্তিকা-লেখকবর্গ তাঁদের হীনম্মন্যতার জন্য তাতে সহজেই স্বীকৃত হন।

অপেক্ষাকৃত স্বাধীন লেখকও রসিকসমাজের প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণ বৈতসিক। এই বৈতসিকতার ফলে নিম্নোক্ত দিকগুলি লক্ষ্য করা যায়।—

ক. ভাবে, ভাষায় ও রীতিতে লেখক পূর্বে প্রকাশিত এই ধরনের অন্য পুস্তিকার অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। কোথাও কোথাও বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব থাকলেও সেই বিষয়বস্তুর চরিত্র (character) পূর্ব প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সমগোত্রীয়। পদ্য-রীতির রচনা হলে তা পয়ার ত্রিপদীর উর্ধ্বে উঠতে পারে না। কোথাও কোথাও বা দুর্বল শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের স্পর্শ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে দেখা গেছে, প্রচলিত কোনো আধুনিক গানের ছন্দও অনেক সময় গৃহীত হয় (কিছু কিছু ছন্দঃপতন প্রত্যাশিত)—যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ করা হয় যে, বিশেষ কোনো আধুনিক গানের সুরে বর্তমান পদ্যটি গাওয়া হবে। গদ্যরীতির পুস্তিকায় গদ্যরীতি অনেক আড়ষ্ট। অভিজাত সাহিত্যের প্রভাবে মাঝে মাঝে ভাষার মধ্যে লেখক তৎসম শব্দ প্রয়োগের (যাকে চলতি কথায় 'সাহিত্য করা' বলে) চেষ্টা করেন। গতানুগতিক অলঙ্কার প্রয়োগও দেখা যায়। ছাপার ভুল ছাড়াও এমন অনেক ভাষাগত ভুল নজরে আসে, যা বলা যায় লেখকের অজ্ঞতা-প্রসূত।

খ. এই জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব নগরাঞ্চল বা নগর-প্রভাবিত অঞ্চল থেকে। নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে রুচির উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি যৌনতা প্রকাশের সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। পথ-পুস্তিকার লেখকরা দ্বিতীয়টিই লাভ করেছেন। আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য লেখকরা এ-জাতীয় কিছু উপাদান কিছুটা সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন। পথ-পুস্তিকার এই যৌনতা একটি বিশেষ ধরনের রসিক সমাজের মধ্যে বেশ খানিকটা চাহিদা সৃষ্টি করে।

গ. রক্ষণশীল ভাষা বা রীতির মতো রক্ষণশীল চিন্তাধারাও পথ-পুস্তিকায় গ্রহণ করা

হয়। পুরোনো আদর্শবোধ, রক্ষণশীল সমাজ-কাঠামো বা পরিবার-কাঠামোর প্রতি সমর্থন এবং রক্ষণশীল নীতি প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়। নারীর সতীত্বের মহিমা ও স্বামীভক্তির কথা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি বিরূপ মনোভাব, মাতৃ-পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, স্ত্রীসমাজের গৃহমুখীনতা—বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের রক্ষণশীলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের মধ্যে যে শিক্ষা বা অর্থের শক্তি রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে প্রগতিশীলতার দিকে ধাবিত হতে চায়, পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত নন এবং লেখকরা এই সমাজের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল।

ঘ. লেখকের মধ্যে অনেক সময় সমকালীন বিষয়বস্তু গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, ফৌজদারী মোকদ্দমার উপযোগী কোনো সংবাদ, কোনো হুজুগে আন্দোলন, সস্তা প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক ঘটনা, অস্বাভাবিক কোনো সামাজিক সম্পর্কগত ঘটনা—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষযবস্তু পথ-পুস্তিকায় গ্রহণ করা হয়। দৈনিক সংবাদপত্র, আঞ্চলিক সংবাদ সংগ্রাহকের তথ্য—ইত্যাদি পথ-পুস্তিকার পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুগুলিব উৎস। যথাযথ সংবাদের চেয়ে লেখকরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সংবাদ ও উত্তেজনাকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন। জনশ্রুতির মধ্যে থাকে সত্য, অর্ধসত্য বা মিথ্যা সংবাদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ শ্রবণজনিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া।

ঙ সমাজের বিচিত্র লোকচরিত্র ও আচরণকে কেন্দ্র করে সমর্থনপুষ্ট দৃষ্টিকোণ নিয়ে পুস্তিকা রচনার আগ্রহ লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। বোকামি, স্বার্থপরতা ইত্যাদির বর্ণনায় নিজের Superiority বোধের আওতায় লেখক রসিক সমাজকে টানতে চান। একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এগুলির অন্তরালেও পুরোনো আদশবোধ ও রক্ষণশীলতা সক্রিয় থেকেছে।

চ. প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদিও লেখকের বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়। এই সমস্ত বিপর্যয়ের সঙ্গে পরিবেশ-বিশেষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এইসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। লেখক এই সুযোগ গ্রহণ করেন।

পথ-পুস্তিকার লেখক বৈতসিক হলেও অভিজাত সাহিত্যের লেখকদের মতো নিজস্ব রসবোধ যে তাঁরা একেবারেই প্রকাশ করেন না—তা নয়। আবর্জনার মধ্যেও স্ফুলিঙ্গের মতো কিছু কিছু রচনাংশ দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কোনো কোনো লেখক নিজের তাগিদেই পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং অনভিজাত প্রেস থেকে তা মুদ্রিত করেন। এই জাতীয় লেখকদের প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। আবার অনেক প্রেসমালিক প্রকাশক অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের সাহিত্যিককে দিয়ে ফরমায়েশী রচনা লেখান। সেখানে সেই

সাহিত্যিক হাত-পা-বাঁধা হলেও তার মধ্যেই কিছু নিজস্ব রসবোধ প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না। আবার অনেক পুস্তিকা সংশোধনের জন্য যখন তাঁদের কাছে দেওয়া হয়, তখন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সাহিত্যিকতাও মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন ভাষা সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে।

পথ-পুস্তিকার লেখকদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতাও দেখা যায়। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, মন্তব্য উপস্থাপনে অনেক লেখক তাঁদের সমাজ-চেতনা প্রকাশ করেছেন। তবে অনেকেই পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজের প্রতি বৈতসিকতায় তাঁদের সমাজ-চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে।

পরিশেষে রুচিগত প্রবণতার বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ পথ-পুস্তিকার প্রসঙ্গে রুচির কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। আমরা অপেক্ষাকৃত অভিজাত সমাজে মিশি, অভিজাত রচনা পাঠ করি। আমাদের রুচিবোধ অনেক উন্নত—অন্ততঃ এটা মনে করে থাকি। তাই পথ-পুস্তিকার রুচি সম্পর্কে আমরা একটা উন্নাসিকভাব মনের মধ্যে পোষণ করি।

বহুবারই একথা বলা হয়েছে যে, পথ-পুস্তিকার রসিক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নাগরিক বা আধানাগরিক সমাজ। অশিক্ষিত ব্যক্তি আবার অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির সহায়তায় রসাস্বাদন করে। বলা বাহুল্য লেখকও তেমন অভিজাত নন, অথবা অভিজাত হলেও পাঠক বা রসিকের প্রতি অনেকখানি নির্ভরশীল। ফলে এই দুই ধরনের লেখকের রচনাতেই রুচির তেমন একটা হেরফের হয় না।

পথ-পুস্তিকার লেখক বা রসিকের রক্ষণশীল মনোভাব সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রেও প্রাচীনপন্থী। প্রাঙ্‌মুদ্রণ যুগের পদ্যরীতিকেই এরা সাধারণতঃ সাহিত্যরীতি বলে মনে করেন। তাই পথ-পুস্তিকা রচনা বলতে তাঁরা পদ্য-পুস্তিকা রচনা বলেই মনে করে থাকেন। তবে এই লেখক বা রসিক সমাজ যেহেতু নাগরিক সমাজের সংস্কারযুক্ত, সেই কারণে তাঁরা রীতির দিক থেকে কখনো কখনো গদ্য বা নাট্যরীতিও গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত দুটি রীতির মধ্যে নাট্যরীতি অবশ্য এঁদের কাছে অপেক্ষাকৃত প্রিয়। নাট্যরীতির একটা বিশেষ ধরনের আবেদন আছে। গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত সমাজে সংলাপ-সংযুক্ত যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা আছে। নগরাঞ্চলের অশিক্ষিত সমাজ শুধু যাত্রা নয়, পরবর্তী কালে 'থিয়েটারও' দেখেছেন। সুতরাং অশিক্ষিত সমাজ ও অর্ধশিক্ষিত সমাজের মজলিশে একজনের পাঠের মাধ্যমে সকলেই রসাস্বাদন করতে পারেন। তাই সাহিত্যরীতি সম্পর্কিত প্রাচীন রুচিবোধের যে কিছু পরিবর্তন হয়নি, তা নয়।

এবং তারই পাশাপাশি রয়েছে রীতিগতভাবে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। অতি ক্ষীণায়তন একটি পুস্তিকায় গদ্য, পদ্য ও নাট্য সংলাপ তিনটি জিনিস একত্র দিয়ে 'বারোভাজা' জাতীয় রচনাতে লেখকের যে রুচিবোধ—তাঁকে প্রশংসা করা অবশ্যই যায় না।

হাস্যরসসৃষ্টি আকর্ষণের একটি সহজ উপায়। পথ-পুস্তিকায় যে জাতীয় হাস্যরস প্রত্যাশিত, তাই আছে। গোপালভাঁড়ের সংস্কৃতি পুষ্ট যারা, তাদেরই খুঁজে পাওয়া যাবে পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ বা লেখকদের মধ্যে। এই ভাঁড়ামি অবশ্য গ্রামীণ সমাজ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তবে উনিশ শতাব্দীর নগরাঞ্চলের অভিজাত সমাজের হাস্যরসে যে Satire-এর আমদানি হয়েছিলো, পরবর্তী কালের পথ-পুস্তিকায় তার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অতএব হাস্যরস সংক্রান্ত রুচির যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না। তবে মাত্রাবোধের অভাবে Satire ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে গিয়ে অভিজাত সাহিত্যের Satire-ধর্মী হাস্যরসের সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য রক্ষা করেছে।

যৌনতা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। বিবাহ, প্রেম, দাম্পত্য আচার-আচরণ সবই সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে। কিন্তু পথ-পুস্তিকায় এইসব বিষয়বস্তুর বর্ণনায় মাত্রা-বোধের অভাবের কথা নতুন করে বলা অনাবশ্যক।

প্রসঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পথ-পুস্তিকা লেখকের সুরুচি-কুরুচির প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে যায়। যেমন, কোনো ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনী, অসহনীয় অবৈধ যৌনাচারের কাহিনী ইত্যাদি আমাদের রুচিবোধকে পীড়া দেয়। অনেকের মত এই যে, প্রসঙ্গ নির্বাচনে রুচিবোধের বিচার আসে না, আসে প্রসঙ্গ উপস্থাপনের রীতির মধ্যে। সেটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন অনেক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা পথ-পুস্তিকা আছে—যার নামকরণ দেখেই ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়।

পথ-পুস্তিকার লেখকদের প্রবণতার মধ্যে আমাদের কাছে অপ্রশংসনীয় বলে সবই হয়তো মনে হবে। এঁদের স্থূল রুচি সমাজের (অভিজাত সমাজের) রুচি উন্নয়নে কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি। বিজ্ঞানের উন্নয়নগত স্বাচ্ছন্দ্য যাদের বরাতে কোনোদিনই জোটে না, সাহিত্যের উন্নয়নগত মানসিকতাও তাদের বরাতে কোনোদিন জোটে না। এরা এদের সমাজ নিয়ে সন্তুষ্ট। এতো কলুষ সত্ত্বেও এদের আনন্দকে আমরা নির্দোষ আনন্দই বলবো। কারণ অভিজাত সাহিত্যের পাঠক সমাজে যেমন মনোজগতের আন্দোলন কর্ম-জগৎকে আন্দোলিত করতে সমর্থ, এদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে এই সমাজের প্রত্যক্ষ কিছু সমস্যার ব্যাপার থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র। সেখানে তা শুধু রসাস্বাদন হতে পারে না।

পথ-পুস্তিকার লেখকদের প্রবণতার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি দিক প্রকাশ পেলেও বৈচিত্র্যও নিতান্ত কম নয়। অবশ্য পথ-পুস্তিকায় লেখক হিসেবে মুদ্রিত নাম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ আসল ও নকল দু-ধরনের লেখকের নামই পুস্তিকার কভারে মুদ্রিত থাকে। লেখককে ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া—যা অভিজাত সাহিত্যের লেখকের ক্ষেত্রে চলে আসছে, তা পথ-পুস্তিকার লেখকের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভব নয়। তবে তাঁদের প্রবণতাগুলির গুরুত্ব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো অস্বীকার করা যাবে না।

পথ-পুস্তিকাগুলির মূল্যায়ন

মানুষের যে কোনো জাতীয় শিল্প-সৃষ্টির মূলে রয়েছে তাগিদ। সুতরাং যে কোনো জাতীয় শিল্পেরই অন্ততঃ কোনো না কোনো মূল্য রয়ে গেছে। অভিজাত সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মূল্য সম্পর্কে চেতনা ও তার গুরুত্ব অবিসংবাদিত। তবে পথ-পুস্তিকার মূল্য অভিজাত মহলে উপস্থাপিত করাও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে অভিজাত সমালোচকদের বক্তব্য : প্রথমতঃ, এর বিষয়বস্তুর কোনো মাথামুণ্ডু নেই। দ্বিতীয়তঃ, এর রুচি অত্যন্ত ঘৃণ্য। তৃতীয়তঃ, অর্ধ-শিক্ষিতের হাতে অসঙ্গত, অপ-প্রযুক্ত ভুলবানানের ভাষা এবং হাস্যকর টেক্‌নিক্—সব কিছু মিলে এমন কতকগুলো আবর্জনা সাহিত্য-জগতের মধ্যে এসেছে যার ধ্বংসই মঙ্গল।

অভিযোগ সবই সত্য। তবে বক্তব্য—বড়ো বেশি নির্মম।

অভিজাত সাহিত্য শিক্ষিতের জন্য। কিন্তু নগরাঞ্চল বা নগর-প্রভাবিত অঞ্চলের বিরাট অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যে সমাজ, তাদের রসাস্বাদনের দায়িত্ব বহন করবার যোগ্যতা অভিজাত লেখকের নেই। পূর্বোক্ত সমাজের মানুষগুলির মানসিক পরিপাক শক্তি বিবেচনা করবার সামর্থ্য তথাকথিত অভিজাত 'গণ লেখকদের' মধ্যেও আদৌ নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে পথ-পুস্তিকার লেখকরাই সেই বিরাট দায়িত্ব যে বহন করেছেন, তা অস্বীকার করা যাবে না। আজ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আইন করে পথ-পুস্তিকা রচনা প্রকাশ বন্ধ করে দিলে সমাজের একটি বিরাট অংশের আনন্দ রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হবে।

পথ-পুস্তিকার সমাজ-চিত্র-গত মূল্য আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী-বৃন্দ নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। যে কোনো সাহিত্যিকই কিছু না কিছু সমাজ সচেতন। কারণ মানুষ সমাজে বাস করে এবং সাহিত্যিকও সমাজে বাস করেন। জীবন সংগ্রামে যাঁদের অবতীর্ণ হতে হয় না, আত্মকেন্দ্রিকতা বা রোমান্টিকতা তাঁদের পোষায়? সেই সৌভাগ্য পথ-পুস্তিকা লেখকদের হয়নি। অবশ্য পথ-পুস্তিকার সমাজচিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুকূল ও প্রতিকূল দুরকম দিকই আছে। সমাজের অনেক অনেক সত্য অভিজাত সাহিত্যে ভীতি বা শালীনতার খাতিরে চিত্রিত করা যায় না। কোনো আন্দোলন সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বা সমাজের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন জাতীয় মতবাদের সন্ধান আমরা অভিজাত সাহিত্য পাঠে হয়তো জানতে পারি। কিন্তু সেই আন্দোলন সম্পর্কে অর্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষরা কী ভাবে, তাদের ওপরে এর প্রভাব কী ধরনের এবং কতোটা, তা

পথ-পুস্তিকার মধ্য দিয়েই জানা যায়। ইতিহাসের আলোক-রশ্মি ওপরের স্তর দিয়ে যাতায়াত করে। সমাজের নীচের স্তর চিরকাল অন্ধকার এবং স্পর্শহীন থেকে যায়। পথ-পুস্তিকা সেই অন্ধকার সমাজের ইতিহাসকেই ব্যক্ত করে। অতি সাধারণ মানুষের যে সমাজ, তার মনস্তাত্ত্বিক গতি-প্রকৃতি, তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও পথ আমরা যদি ভালোভাবে জানতে পারি, তাহলে সামাজিক ইতিহাসের এক অমুক্ত অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যাবে।

গুজব বা ভ্রমাত্মক লোকশ্রুতির প্রতি হয়তো পথ-পুস্তিকা—লেখকদের নির্ভরশীলতা রয়েছে। কিন্তু সমাজে গুজব বা ভ্রমাত্মক লোকশ্রুতির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে কিনা, যদি না থাকে তবে সেগুলি কোন পথে ছড়িয়েছে বা কেন ছড়িয়েছে, এইসব বিচারের মধ্য দিয়ে এই সমাজের মানসিকতা বিশ্লেষণে অনেক সুবিধা হয়। যারা সেই মানসিকতার স্বরূপ নির্ণয় বা ধারা পথ আবিষ্কার করতে চান, পথ-পুস্তিকা তাঁদের সহায়তা করতে পারে।

পথ-পুস্তিকা লেখকদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বোধ আশা করা অনুচিত। মাত্রাবোধের অভাবে বস্তুর মধ্যে অতিরঞ্জন বা কল্পনা এসে ভিড় করেছে। কিন্তু আধুনিক সমাজ চিত্র নির্ধারক মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে হলে তার ভালো ও খারাপ—দুটি দিকই জানা দরকার। ভালোর পরিমাপ করতে হয় খারাপ দিয়েই। আলোর দ্বারা আমরা উপকৃত হই ঠিকই; কিন্তু কোন্ অন্ধকার অতিক্রম করে আমরা আলোর মধ্যে চলাফেরা করছি, সেই অন্ধকারের স্বরূপ জানবার কি আদৌ প্রয়োজন নেই? পথ-পুস্তিকার মধ্যে সেই অন্ধকার রাজ্যের কথা পাই। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অবদান নিয়ে আলোচনার অভাব নেই। কিন্তু তা একটি দিক মাত্র। চাঁদের আর একটি দিক অন্ধকার। অন্ধকার আমাদের অজানা থাকে বলে আমরা মানুষকে দেবতা বানিয়ে তুলি। কিন্তু মানুষ যে মানুষই, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পথ-পুস্তিকায়, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সম্পর্কে সেই না-জানা জগতের খবর ঐ পুস্তিকার লেখকরাই দিতে পারবেন। মহাপুরুষ বলে স্বীকৃত ব্যক্তি সদ্‌গুণের যোগফল না হলেও তাতে মানুষ হিসেবে মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে প্রচারের চাপে অপদেবতা দেবতা হলে তা সমাজের প্রতি প্রতারণা করা। পথ-পুস্তিকা অনেক সময় সত্য ভাষণে সঙ্কুচিত হয় না।

সাম্প্রতিককালে জনতা-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বেশ একটা হিড়িক পড়ে গেছে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জনতা-মনস্তত্ত্বের গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়। এজন্য প্রচলিত সমকালীন পথ-পুস্তিকার মূল্য যেমন রয়েছে, তার অতীতের ধারা উপলব্ধির জন্য পূর্ববর্তীযুগের পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে গবেষণারও অবকাশ আছে।

এবারে পথ-পুস্তিকার সাহিত্যগত মূল্যের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। গ্রামীণ লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে স্বাস্থ্য আছে, নাগরিক অপুষ্টি রোগগ্রস্ত পথ-পুস্তিকার মধ্যে হয়তো সেই স্বাস্থ্য নেই। গ্রামীণ লোক-সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও নাগরিক অভিজাত সাহিত্যের সম্পদ—উভয় দিক থেকেই বঞ্চিত রয়েছে এই হতভাগ্য পথ-পুস্তিকা। পথ-পুস্তিকার কাছে অভিজাত সাহিত্যিকের কি কোনো ঋণ আছে? এর উত্তর বিতর্কিত। তার মধ্যে আমরা যদি মন্তব্য করি, সমকালীন পথ-পুস্তিকার মধ্যে যে জনপ্রিয়তার উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, অভিজাত সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে সেই সন্ধান কাজে লাগিয়ে থাকেন অনেক সময়;—তাহলে তা পুরোপুরি মিথ্যা বলা হবে না। উনিশ শতাব্দীর নাটক প্রহসনের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ মিলেছে। অনেক পথ-পুস্তিকা-কর অভিজাত সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার বিষয়বস্তুও ধরিয়ে দেন।

যে-সব সাহিত্যকে আমরা 'সাহিত্যের আগাছা' নামে অভিহিত করেছি, সেগুলির মধ্যে ভাবগত বা চিন্তাগত মৌলিকতা হয়তো প্রায় সবক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। কিন্তু অক্ষম লেখনীর মধ্য দিয়েই এমন কিছু উপাদান বেরোনো সম্ভবপর—যার থেকে ভাবগত বা চিন্তাগত সম্পর্ক রেখেই নতুন উন্নততর ও গভীর ভাব ও চিন্তার জন্ম হতে পারে। বিভিন্ন সাহিত্যের ভাবরাজ্যে বা চিন্তারাজ্যে যা প্রতিভায় দীপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার প্রস্তুতির কিছু কিছু ইতিহাস রয়ে যায় 'আগাছা'গুলির মধ্যে।

পথ-পুস্তিকার অবয়ব যুক্ত কিছু অবশ্য অভিজাত সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেগুলি যখন পথ-পুস্তিকা নয়, তখন তার সাহিত্য মূল্য নিরূপণের প্রশ্ন আসে না। অনেক আধা-সাহিত্যিকের নিজের তাগিদে প্রকাশ করা পথ-পুস্তিকাধর্মী পুস্তিকাগুলি অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে বিচার্য হতে পারে। বলা বাহুল্য সে জাতীয় রচনার ফাঁকে ফাঁকে কখনো বা কিছু দীপ্তি থাকে। পথ-পুস্তিকা ব্যবসায়ীর সাহিত্যিককে দিয়ে লেখানো বা সংশোধন করানো রচনাতেও যে দীপ্তি থাকে না তা নয়। তবে পথ-পুস্তিকার সাহিত্য-মূল্য নিয়ে ওকালতীও বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া পথ-পুস্তিকার সীমারেখার কাছাকাছি কিছু সাহিত্যগুণ সমন্বিত রচনা আছে। সীমান্তের রচনাগুলি নিয়ে চিরকালই মতবিরোধ চলে এসেছে এবং এই জাতীয় রচনার সংজ্ঞা সম্পর্কেও হয়তো ভবিষ্যতে মতবিরোধ হবে। সুতরাং এগুলির সাহিত্য-মূল্য তখন অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিচার করা হবে।

সাহিত্যের গভীরতার একটি দিক যেমন আছে, তেমনি ব্যাপ্তিরও একটি দিক আছে। ব্যাপ্তিও গভীরতার অনুপাত নিয়ে বিতর্ক চিরকালই থাকবে। কিন্তু ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে শেষ প্রান্ত কোথায়, তা আমাদের জানা হয়তো এক সময় দরকার হতে পারে; পথ-পুস্তিকা সেদিক থেকে সহায়তা যে করবে, এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা

বাংলা পথ-পুস্তিকাগুলি কালের বিধানে যথারীতি বিলুপ্ত হবে। সবই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে—বিশেষ করে আগেকার লেখা পথ-পুস্তিকাগুলি। বিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা এখনো কিছু কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই এই শতাব্দীর লেখা পুস্তিকার তালিকা বাদ দিয়ে উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকার একটি তালিকা দিচ্ছি। অন্ততঃ নামগুলি বেঁচে থাকুক। নামের সঙ্গে আর যেটুকু পেয়েছি, তা আমাদের উপরি পাওনা। কতকগুলি পাঠাগারে উনিশ শতাব্দীর কিছু কিছু সংবাদপত্র সংরক্ষিত আছে। অনাগত কোনো গবেষক এ-গুলির পাতা উল্টিয়ে এই পথ-পুস্তিকাগুলির মধ্যে কতকগুলির উৎস জেনে নিতে পারবেন। তারিখ যতোটা সম্ভব দেওয়া হলো। প্রকাশের তারিখ হিসেব করে সংবাদ বা মন্তব্যগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে। মূল পুস্তিকার জন্য এদেশের পাঠাগার ঘুরতে হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বইগুলির যদি বাস্তব অস্তিত্ব থাকে তো আরো ভালো হয়। আমার তালিকা দেবার উদ্দেশ্য এই যে, পথ-পুস্তিকার তালিকা পাঠ করলে উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা জন্মাবে। আমার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি না। হয়তো এমন কয়েকটি বই-এর মধ্যে ঢুকে গেছে যা আদৌ পথ-পুস্তিকার গোত্রে পড়ে না। আবার প্রচুর বই হয়তো ছিলো, যা এই তালিকায় দেওয়া সম্ভব হয়নি—কারণ তার নামও হারিয়ে গেছে।

বর্তমান গ্রন্থে উনিশ শতাব্দীর প্রতি পক্ষপাতের কারণ—গ্রন্থটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে।

পরিশেষে আর একবার একটি কথা স্মরণ করাতে চাই। উনিশ শতাব্দীর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অভিজাত সাহিত্যিকের আভিজাত্যবোধ তেমন টনটনে ছিলো না। তাই প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও আট-দশ পৃষ্ঠার বই লিখতে সঙ্কুচিত হতেন না। যে-যুগে ছাপানো বইয়ের লেখক—এটারই একটা বড়ো মহিমা ছিলো। তাই এখনকার অভিজাত লেখক যেমন এক ফর্মার বই ছাপতে চান না (এখন অবশ্য অন্য ধরনের ক্ষীণায়তন বই ছাপবার একটা হাওয়া উঠেছে), পাছে কেউ ভেবে বসেন, ইনি পথ-পুস্তিকার লেখক ! অভিজাত সাহিত্যিক 'গণসাহিত্যিক' হতে চাইলেও অনভিজাত হতে চান না।

অতএব সে-যুগে একদিকে যেমন পথ-পুস্তিকার মধ্যে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব ধরনের লেখকই মিশে গেছেন, তেমনি তাঁদের সে-সব সাহিত্যরচনা পথ-পুস্তিকার স্তর থেকে তেমন

বেশি দূর উঠতেও পারেনি। তখনকার দিনের শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত লোকের বারো পাতার একটি বইয়ের তুলনায় এখনকার একটি অপ্রতিষ্ঠিত অর্ধ শিক্ষিত লোকের বারো পাতার বই খুব বেশি পার্থক্য রক্ষা করে না। তাই পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে ভূমিকায় যে-সব আলোচনা আছে, তা সর্বক্ষেত্রে উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকার বিষয়ে প্রযোজ্য নয়,—এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

কালানুক্রমিকভাবে কতকগুলি পুস্তিকার তালিকা দিলাম। রচনাকালের ব্যাপারে যেখানে অনিশ্চয়তা আছে, সেখানে তা পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত করেছি।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ

১. **নির্বোধ বোধ—লেখক অজ্ঞাত॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬। বাঙালীর আখড়ায় সচরাচর যে গানগুলি গাওয়া হতো, সেগুলির নিন্দা করে লেখা একটি 'Farce'. প্রকাশ তারিখটি সন্দেহজনক।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ

২. **পূর্ণ সখের ক্ষুণ্ণভাগ—তারিণীচরণ মর্দাণী॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। বইটিতে পৃথিবীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, হিন্দু মহিলাদের খুবই দুর্দশা। অন্ততঃ বিধবা-বিবাহের সম্মতি দিয়ে ভগবান যেন এঁদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করেন। স্বপ্নদর্শনের মধ্যে দিয়ে এই প্রার্থনার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ

৩. **নীলকরদিগের কি অত্যাচার—লেখক অজ্ঞাত॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা বইটিতে প্রকাশ পেয়েছে। তারিখটি আনুমানিক।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

৪. **ঘুঘু ও ফাঁদ—লেখক অজ্ঞাত॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। প্রতারকও একদিন জব্দ হয়—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখা একটি সরস গল্পের পুস্তিকা।

৫. **কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়॥** পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। পুস্তিকার কন্যাপণের বিরুদ্ধে। কাহিনী পরে দ্রষ্টব্য।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ

৬. হায় এ কি অদ্ভুত ঝড়—মহেশচন্দ্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে বিধ্বংসী সাইক্লোন হয়েছিলো, তার ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা করে পুস্তিকাটি রচিত।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ

৭. কি ভয়ানক আশ্বিনে ঝড়—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রকাশ স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। পূর্বোক্ত তারিখে সংঘটিত ঝড়ের পরিণতিকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী পুস্তিকার অনুকরণে এই বইটি লেখা হয়েছে।

৮. হায়রে আশ্বিনে ঝড়—মহেশচন্দ্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একই লেখকের অন্য একটি বই—একই বিষয়-বস্তু নিয়ে লেখা। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী বইয়ের কাটতিতে উৎসাহিত হয়ে লেখা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঝড় নিয়েই লেখা।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ

৯. এ কি অসম্ভব ঝড়—মহেশচন্দ্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেও আবার ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মতো ঝড় হয়। এই বিধ্বংসী ঝড় সাধারণ মানুষের ক্ষতি যা-ই করুক, বর্তমান লেখকের ক্ষতির বদলে অনুপ্রেরণাই যুগিয়েছে। ঝড় সম্পর্কে ইতিমধ্যে দুটি বই লিখে তিনি উৎসাহিত।

১০. জঙ্গলে ঝড়—তারিণীচরণ দাস॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের বিধ্বংসী সাইক্লোন নিয়েই লেখা হয়েছে বইটি।

১১. কার্তিকে ঝড়—গোপালচন্দ্র দাস॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। লেখকের বাড়ী খিদিরপুরে। পূর্ববর্তী গ্রন্থের অনুরূপ বিষয়বস্তু, পদ্যাকারে লেখা।

১২. কার্তিকে ঝড়ের পাঁচালী—ঈশ্বরচন্দ্র সরকার॥ প্রকাশ স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। একই বিষয়বস্তু অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে (কার্তিক মাসে) সংঘটিত সাইক্লোনকে কেন্দ্র করে এই বইটিও লেখা।

১৩. রামপুরার যথকিঞ্চিৎ—মুরারিমোহন বিশ্বাস॥ প্রকাশস্থান—রামপুর, বিউলিয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বাঙালী যুবকদের নানা ধরনের পাপ কাজের নিন্দাসূচক বিবৃতি দিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

১৪. কলির বৌ হাড় জ্বালানী—গোলাম হোসেন ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। সমকালীন পুত্রবধূদের স্বাধীন মনোভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণে পুস্তিকাটি রচিত।

১৫. ননদ ভাজের ঝগড়া—মুন্‌শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বাঙালীর সংসারে ননদ এবং ভ্রাতৃবধুর প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা। পুস্তিকাটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বলে অন্যত্র উল্লেখ থাকলেও, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দই পুস্তিকাটির যথার্থ প্রকাশ কাল বলে মনে হয়।

১৬. রাঁড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্‌—জগচ্চন্দ্র গুহ ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা-১১। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আকারে একটি কাহিনী এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৭. নতুন ঝড়—মুন্‌শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। পুরোনো ঝড ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের। নতুন ঝড়ের অর্থ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের (পূর্বে উল্লিখিত) ঝড। সেই ঝড়কে কেন্দ্র করেই পুস্তিকাটি রচিত।

১৮. প্রবল ঝটিকা—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশ স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। এর বিষয়বস্তুও সেই এক, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের (কার্তিক মাসের) সাইক্লোন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৯. সুরা বিরুদ্ধে অভিযোগ—চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। সমকালীন সমাজে মদ্যপান এবং মাতলামি নিয়ে পদ্য আকারে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২০. সুরা সঙ্কীর্তন—শ্যামাচরণ মল্লিক ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১। (পৃষ্ঠা সংখ্যা একটু বেশি হলেও স্বভাবে পথ-পুস্তিকা বলে মনে হয় ; অন্তর্ভুক্তি বিবেচ্য।) পুস্তিকাটিতে মদ্যপানের মহিমা ব্যক্ত করা হয়েছে নিন্দাত্মক দৃষ্টিকোণে। পদ্যাকারে লেখা হয়েছে বইটি।

২১. বাবুদের দুর্গোৎসব—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। দুর্গোৎসবের নামে বাবুসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও নষ্টামির চিত্র পুস্তিকাটির মধ্যে রয়েছে। হাস্যরসাত্মক নক্‌শা আকারে বইটি লেখা।

২২. বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা—মুন্‌শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। সমকালীন প্রতিষ্ঠাকামী কোনো গ্রামীণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে সম্ভবতঃ লেখা। পুস্তিকাটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বলে নথিতে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই পুস্তিকাটি প্রকাশ পেয়েছে।

২৩. **কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে—সেখ আজিমদ্দী** ॥ প্রকাশস্থান—গরাণহাটা (কলকাতা)। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বৃদ্ধের বিবাহকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। কাহিনী পরে দ্রষ্টব্য।

২৪. **মনোহর ফেঁসেড়া—মুন্‌শী নামদার** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানতে পারা যায়নি।

২৫. **ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো—শীতলনাথ চৌধুরী** ॥ প্রকাশস্থান—যশোহর। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে ভয়াবহ সাইক্লোন হয়, তাকে কেন্দ্র করে এটিও লিখিত হয়েছে। লেখকের মত এই যে, কলিযুগের পাপগুলির জন্যই ভগবান স্বয়ং ঝড়ের মাধ্যমে মানুষকে শাস্তি দিয়েছেন।

২৬. **কলির বৌ হাড় জ্বালানি—মুন্‌শী নামদার** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। সমকালীন পুত্রবধূদের স্বাধীন মনোভাব ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে পুস্তিকাটি লিখিত হয়েছে।

২৭. **দুই সতীনের ঝগড়া—মুন্‌শী নামদার** ॥ প্রকাশস্থান কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বহুবিবাহের বিষময় পরিণতি স্বরূপ দুই সপত্নীর কলহকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২৮. **অঙ্গনা প্রসঙ্গ—জগচ্চন্দ্র রায়** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের প্রতি কিছু দাম্পত্য নীতি নিয়ে উপদেশ এবং স্ত্রীসমাজের অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে।

২৯. **স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন—কালীপ্রসন্ন বসু** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বইটির মধ্যে স্বামী ভক্তি এবং স্বামীর আজ্ঞানুবর্তিতা সম্পর্কে দুজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন রয়েছে।

৩০. **কালিয়া—লেখক অজ্ঞাত** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পাড়াগাঁয়ের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের বিবরণ পুস্তিকাতে আছে। এটা পদ্যের আকারে লেখা।

৩১. **বদমাশ জব্দ—লেখক অজ্ঞাত** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে Contagious Disease Act (XIV of 1868) বিধিবদ্ধ হয়। তার সুফলের কথা উল্লেখ করে পুস্তিকাটি রচিত।

৩২. **বেশ্যা গাইড—গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এটিও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের Contagious Disease Act-কে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে।

৩৩. **বেশ্যা বিবরণ—লেখক অজ্ঞাত**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এরও বিষয়বস্তু সেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের Contagious Disease Act.

৩৪. **বাহবা চৌদ্দ আইন—লেখক অজ্ঞাত**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। আইন বিশেষকে কেন্দ্র করে লেখা।

৩৫. **বিধবা-বিবাহে শেষ ফল—উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**॥ প্রকাশ-স্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে তার ফল যে সমাজ-জীবনে ভয়ঙ্কর হবে, এই মতবাদ নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৩৬ **কান্তাবিচ্ছেদ—কেদারনাথ সেনগুপ্ত**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একজন লোক তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ ছিলো। সে সর্বদাই তার স্ত্রীকে কুৎসিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে মানসিক যন্ত্রণা দিতো। অথচ তার স্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র এবং পতিব্রতা ছিলো। একদিন স্ত্রী যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলো এবং স্বামীর সন্দেহ ও তিরস্কার থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেলো।

৩৭ **কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি—মুন্শী নামদার**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। সমকালীন বাঙালী সমাজের পরিবারে পুত্রবধূরা প্রবেশ করে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়। বিশেষ করে পুত্রবধূদের এই প্রবণতাকে নিন্দা করেই পুস্তিকাটি লিখিত।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ

৩৮. **সতী নারী কি ঝকমারী—কুশদেব পাল**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪। (ঈষৎ পুষ্টায়তন হলেও পথ-সাহিত্য-ধর্মী রচনা। অন্তর্ভুক্তি বিবেচ্য)। দুইবোনের সঙ্গে একজন লোকের একই সঙ্গে বিয়ে হলে বোন-সতীনের মধ্যে ঝগড়া ও পরিণতি কী মর্মান্তিক যে হয়, সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে সামাজিক নক্শা আকারে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৩৯. **দুর্গা সমাগম—ইচ্ছারাম সিংহ**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬। শরৎকালে দুর্গোৎসবের সময়ে দেবীর আগমন উপলক্ষে গদ্যে পদ্যে রূপকের মাধ্যমে কাহিনী পুস্তিকাটির মধ্যে রয়েছে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ

৪০। **বিয়ের জন্যই জাতিটা গেল—প্রিয়মোহন মহিন্তা**॥ প্রকাশ-স্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বিবাহে পণপ্রথার চাপে বাঙালী জাতি ধ্বংস হতে চলেছে, এই মন্তব্য করেই সামাজিক নক্শার আকারে বইটি লেখা হয়েছে।

৪১. **সবুর মেওয়া ফলে—নীলকণ্ঠ মিত্র**॥ প্রকাশস্থান—শ্রীরামপুর।

পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে বাঙালী পরিবারের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী পুস্তিকাটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

৪২. **ষষ্ঠী বাঁটা বিষম ল্যাঠা—মুন্‌শী নামদার**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরগৃহে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে যে আনন্দানুষ্ঠান ঘটে, তার মধ্যেকার কতকগুলি স্ত্রীঘটিত জঘন্য কুপ্রথার কুফল দেখানোই পুস্তিকাটি রচনার উদ্দেশ্য।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ

৪৩. **চাই বেলফুল—অঘোরচন্দ্র ঘোষ**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বেশ্যা সমাজের ছল-চাতুরীর ঘটনাগুলি গ্রথিত করে পদ্য আকারে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৪৪. **দেখলেই হাসতে হবে—বাবুলাল নাথ**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলকাতা শহর নানা দুর্নীতিতে ভরপুর। এইসব দুর্নীতির কথা বর্ণনা করে পুস্তিকাটি রচিত। লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্য হাস্যরস সৃষ্টি।

৪৫. **ডেঙ্গুজ্বরের পাঁচালী—মহেশচন্দ্র দাস দে**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেঙ্গুজ্বরের ব্যাপক আবির্ভাব কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলো। ডেঙ্গুজ্বরের ফলে কী অবস্থা হয়, তার বর্ণনা করে বইটি লেখা হয়েছে।

৪৬. **কি ভয়ানক—চন্দ্রনাথ রায়**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। মদ্যপানের কুফলকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৪৭. **মান তরঙ্গিনী—রাসবিহারী রক্ষিত**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। সাধারণ লৌকিক সমাজে যা জনপ্রিয়, এমন উপাদান নিয়ে লেখা কতকগুলি প্রেমসঙ্গীত পুস্তিকাটির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

৪৮. **রঙ্গীন টপ্পা—মহেশচন্দ্র দাস দে**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সমকালীন সমালোচনার যোগ্য বিষয় নিয়ে লেখা কতকগুলি সঙ্গীত বইটির মধ্যে আছে।

৪৯. **স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যাভ্যাস—লেখক অজ্ঞাত**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। স্ত্রী শিক্ষার সুফলকে গুরুত্ব দিয়ে লেখা এটি একটি কথোপকথনমূলক পুস্তিকা।

৫০. **এই এক মজা—অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ**॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। সুরাপান ও অন্যান্য অসংযমের কুফলকে ইঙ্গিত করে এই নক্শাটি গদ্যে পদ্যে লেখা হয়েছে।

৫১. একজন দুঃখিনীর বিলাপ—লেখক অজ্ঞাত॥ স্বামীর সুরাপান ও অন্যান্য অসংযমে বেদনার্ত হয়ে এক হিন্দু মহিলা যে বিলাপ করেছেন, তারই বর্ণনা এই পুস্তিকাতে আছে। বিলাপের মধ্যে দিয়ে স্বামীর চিত্তবিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে পুস্তিকাটিতে।

৫২. আক্কেল সেলামী—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। এটি গদ্যে পদ্যে লেখা একটি পুস্তিকা। একটি মানুষ আর্থিকঅভাবে প্রতারিত হয়ে কীভাবে আক্কেল সেলামী লাভ করেছিলো, তারই সরস বিবরণ পুস্তিকাটিতে আছে।

৫৩. বিয়ে পাগলা—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পুস্তিকাটিতে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আছে। কাহিনীর মূল বক্তব্য এই যে, বিবাহই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

৫৪. জোর নক্সা—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। একজন ধর্মধ্বজ ভণ্ডের কুকীর্তির বিবরণ দিয়ে লেখা নক্‌শাধর্মী একটি কাহিনী এই পুস্তিকাটির বিষয়।

৫৫. নারীর ষোলকলা—নন্দলাল রায়॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। নারীচাতুরীর বিষয়ে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে পুকিাটি লেখা হয়েছে।

৫৬. বিমলা—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বহুবিবাহের অভিশাপে বিমাতার হাতে সতীনের মেয়ে কীভাবে যন্ত্রণা সহ্য করে, তার বিবরণ কাহিনীর মাধ্যমে পুস্তিকাটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

৫৭. টেক্ টেক্ না টেক্ না টেক্ একবার তো সি—অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এটি একটি সামাজিক নক্‌শা-ধর্মী রচনা।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

৫৮. সকের ঠানদিদি—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—চুঁচুড়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। একটি বিবাহিতা নারীর অবৈধ গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনীকে অবলম্বন করে বইটি লেখা হয়েছে।

৫৯. সংসার কাব্য—শ্যামাচরণ কবিরত্ন॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হিন্দু সমাজের জীবনযাত্রায় নানা ক্ষেত্রে অধঃপতনের বর্ণনা দিয়ে পদ্য আকারে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৬০. **পতিভক্তি—অনন্তরাম মিত্র** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের সর্বাত্মকভাবে একনিষ্ঠ থাকা উচিত, এই মতবাদ পুস্তিকাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

৬১. **বহুবিবাহ—লেখক অজ্ঞাত** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। বহুবিবাহের কুফলকে কেন্দ্র করে পদ্য আকারে বইটি লেখা হয়েছে।

৬২. **যমালয়ে এলোকেশীর বিচার—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। তারকেশ্বরের এক মোহন্তের কুকীর্তি নিয়ে এই সময়ে একটি মামলা চলে। সেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই পুস্তিকাটি লেখা। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি এলোকেশী নামে একজন নারীর সতীত্ব নষ্ট করে। এলোকেশীর স্বামী নবীন এলোকেশীকে হত্যা করে। লেখক যমালয়ে এলোকেশীর বিচারের একটা কল্পিত চিত্র পুস্তিকাটির মধ্যে দিয়েছেন।

৬৩. **আজকের বাজার ভাও—দুর্গাদাস ধর** ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির লাম্পট্যের কাহিনীকে উপলক্ষ করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

৬৪. **গত নিকাশ ও হাল বন্দোবস্ত—শ্রীনাথ কুণ্ডু** ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭। পুস্তিকাটি ডাক্তারীবৃত্তির দুর্নীতি নিয়ে লেখা হয়েছে।

৬৫. **বিদ্যাসুন্দরের নতুন টপ্পা—নন্দলাল রায়** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। নামকরণেই বক্তব্য প্রকাশিত। কতকগুলি টপ্পাধর্মী সঙ্গীত পুস্তিকাটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ

৬৬. **বউ কথা ক'—অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

৬৭. **ড্রেনের পাঁচালী—অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলকাতার নর্দমা ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে পদ্যাকারে লেখা একটি বই।

৬৮. **দুর্ভিক্ষ চিন্তামণি—আনন্দচন্দ্র কাইলাই** ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। সমকালীন খাদ্যাভাব ও তার পরিণতির বর্ণনা দিয়ে বইটি লেখা হয়েছে।

৬৯. **একেই বলে পোল—অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ** ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হুগলী নদীর ওপরে চ্যাপ্টা তল-বিশিষ্ট নৌকো দিয়ে

পোল তৈরী হয়েছে। এই পোল নির্মাণকে কেন্দ্র করে পদ্য আকারে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

৭০. **পোলের কবি—আমিনচন্দ্র দত্ত॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্বোক্ত বিষয় নিয়ে পদ্যাকারে বইটি লেখা।

৭১. **পোলের পাঁচালী—জহরীলাল শীল॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এই বইটিরও একই বিষয়বস্তু।

৭২. **পোলের টপ্পা—নন্দলাল রায়॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীতের সংকলন-পুস্তিকা এটি।

৭৩. **পোলের পাঁচালী—নন্দলাল রায়॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। পূর্বোক্ত বিষয় নিয়ে পদ্যাকারে বইটি লেখা।

৭৪. **কুলীন কীর্তন—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়॥** প্রকাশস্থান—ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহের বিভিন্ন সামাজিক দোষকে উল্লেখ করে পুস্তিকাটি রচিত।

৭৫. **মোহন্ত এলোকেশীর গীত—যদুনাথ রায়॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি এলোকেশীর সতীত্ব নাশ করে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতের সংকলন এই পুস্তিকাটি।

৭৬. **মহন্ত টপ্পা—নন্দলাল রায়॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্বোক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কতকগুলি গান বইটির মধ্যে রয়েছে।

৭৭. **মহন্ত বিলাপ—রাজকৃষ্ণ রায়॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১২। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি এলোকেশীর সতীত্ব নাশ করে দণ্ড-প্রাপ্ত হয়। এই দুরবস্থায় তার বিলাপ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

৭৮. **মহন্তের খেদ—অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্বোক্ত বিষয়বস্তু নিয়েই এই পুস্তিকাটি রচিত। দুরবস্থায় মোহন্তের খেদ এখানে বর্ণিত।

৭৯ **মহন্তের সর্বনাশ—জহরীলাল শীল॥** প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। তারকেশ্বরের মোহন্ত তার কুকীর্তির জন্য দণ্ডাদেশ পায়। তার শাস্তির সঙ্গে তার দ্বারা ধর্ষিতা নারীর স্বামী নবীনের স্ত্রীহত্যার অভিযোগ থেকে অব্যাহতিলাভের প্রসঙ্গও এতে আছে।

৮০. **উঃ বাবাঃ মামার বিচার—অঘোরচন্দ্র ঘোষ॥** প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। বইটি সমকালীন কোনো একটি ঘটনা নিয়ে লেখা হলেও এর বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। তবে এটি পথ-পুস্তিকা।

৮১. বসন্ত আগমনে মহন্তের বিলাপ—রামচরণ ঘোষ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। দণ্ডপ্রাপ্ত তারকেশ্বরের মোহন্ত বসন্তের আগমনে বিলাপ করছে। বলা বাহুল্য কল্পিত বিলাপ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

৮২. বেশ্যাই সর্বনাশের মূল—চণ্ডীচরণ ঘোষ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনে বেশ্যাসক্তির কুফলের বর্ণনা দিয়ে এবং তার সঙ্গে সব কিছুর মূলে গণিক সমাজকে দায়ী করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮৩. সুমতি স্থির ভব—তারিণীচরণ মর্দানী॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়ন সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা পুস্তিকাটিতে আছে।

৮৪. মোহন্তের যেসা কি তেসা—নারায়ণ চন্দ্র॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। পূর্বে-উল্লিখিত তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির কুকীর্তিকে কেন্দ্র করে এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৮৫. এলোকেশী, নবীন, মোহন্ত—রাজেন্দ্রলাল দাস॥ প্রকাশ-স্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বইটি লেখা হয়েছে।

৮৬. বড় বাজারের লড়াই—সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রকাশ স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হগ্ সাহেব এবং হীরালাল শীলের বাজার ঘটিত সুবিখ্যাত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত।

৮৭. মদ মাহাত্ম্য—চন্দ্রকিশোর বসু মজুমদার॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০। মদ্যপানের বিরুদ্ধে পুস্তিকাটি লেখা।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ

৮৮. আকালের পুঁথি—আব্দুল রহিম॥ প্রকাশস্থান—গোলাচিপা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। খাদ্য ও অন্যান্য সমস্যা জর্জরিত মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে লেখা এই পুস্তিকাটি।

৮৯. আনন্দময়ীতলার পাঁঠাচুরি—রজনীবল্লভ চট্টোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলকাতার আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে বলির জন্য যে পাঁঠা রাখা হয়েছিলো, একদিন তা চুরি যায়। কালীভক্ত জনসাধারণের মনে এতে খুব আতঙ্ক হয়। কারণ মা কালী ভয়ঙ্করী দেবী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৯০. ভালবাসার মুখে ছাই—প্যারীমোহন সেন ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বাঙালী স্ত্রীলোকদের মধ্যে আর পতিভক্তি ও পতিপ্রেম নেই, এই সিদ্ধান্ত একটি গদ্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। (তথ্যটি সন্দেহজনক)।

৯১. দেবদেবীর বিপদ—অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। শিব ও কালীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দেবদেবীর বিপদের কথা কল্পিত হয়েছে পুস্তিকাটিতে।

৯২. এবার পূজার বড় ধুম—যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। দুর্গোৎসবের আগমন উপলক্ষে বাঙালীর মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

৯৩. এই এক হুজুক—অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। কলকাতার বাঙালী সমাজে ব্যাপকভাবে যে-সব অন্যায় জিনিসগুলি চলে, তাকে কেন্দ্র করে পদ্যাকারে পুস্তিকাটি লিখিত।

৯৪. গভর্ণর সাহেবের শুভাগমন—নবকুমার নাথ ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯। বাংলায় লেফটেনান্ট গভর্ণরের যশোহর পরিদর্শন উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে পদ্যাকারে পুস্তিকাটি লিখিত।

৯৫. জগন্নাথের মন্দির পতন—রামচন্দ্র শীল ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ ও পতনের বিবরণ এই পুস্তিকায় দেওয়া হয়েছে।

৯৬. জেলে মেছনীর খেদ—জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। মাছে ব্যাপকভাবে 'পোকা' হওয়ায় এবং অসুখের ভয়ে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় মাছ অবিক্রীত অবস্থায় বাজারে থাকে। তাতে জেলে ও মেছুনীরা দুঃখ করে। সেই খেদোক্তি পুস্তিকাটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

৯৭. মাছের বসন্ত—দ্বিজরাজ শর্মা ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। মাছের মধ্যে রোগ দেখা দেওয়ার একটি সমকালীন ব্যাপার নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা। (এই ঘটনাটি সম্বন্ধে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা আছে।)

৯৮. মাছ খাব কি পোকা খাব—চিন্তামণি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশ-স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু নিয়ে এই বইটিও লেখা হয়েছে।

৯৯. মাছের পোকা—জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা-১২। এই বইটির বিষয়বস্তুও মাছে পোকা সম্পর্কে সাধারণের মনে যে উত্তেজনা এসেছিলো, সেই ঘটনা নিয়েই লেখা। পদ্য আকারে বইটি লেখা।

১০০. মদনমোহন চটে লাল—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। যুবসমাজের ব্যাপক মদ্যপান এবং তার কুফলকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত।

১০১. মনোহর টপ্পা—রাজেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ০। সাধারণ লৌকিক সমাজের উপযোগী কতকগুলি টপ্পা ধরনের সঙ্গীত এই পুস্তিকাটিতে আছে।

১০২. মেছেনীর দর্পচূর্ণ—আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ক্ষুরধার জিহ্বাসম্বলিত মেছুনীদের দর্পিতা বলেই মনে হয়। মাছে পোকার হুজুগে মাছ অবিক্রীত থাকায় এইসব মেছুনীরাও কাকুতি মিনতি করে মাছ কেনার জন্য। তাদের এই দুরবস্থাকে রসাত্মকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এই বইটিতে।

১০৩. নকুলেশ্বরের বিপদ—অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কালীঘাটের কালীর গয়না চুরিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। ভয়ঙ্করী দেবী কালীর অভিশাপ সম্পর্কে সাধারণ লোকে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলো এই সময়ে।

১০৪. ফাঁসীর হুকুম—অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সোনাগাজীর (অধুনা সোনাগাছি) বিখ্যাত খুনে খুনী আসামীর প্রাণদণ্ড হয়। খুনীর বিচার এবং রায়ের কথা পুস্তিকাটিতে আছে।

১০৫. সোনাগাজীর খুন—অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সোনাগাজীতে একজন স্ত্রীলোক তার উপপতি কর্তৃক নিহত হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১০৬. টাকা—আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। টাকাই সব কিছুর মূল এবং বিচিত্র ক্ষেত্রে টাকার ব্যবহারকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত।

১০৭. মনোজ্ঞ কাহিনী—আহম্মদ (শেখবাবু নামে পরিচিত) ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। দুই বিবাহের কুফলকে কেন্দ্র করে লেখা একটি ক্ষুদ্র কাহিনী পুস্তিকাটির মধ্যে আছে।

১০৮. ডেপুটিবিভূতি যোগ—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—হরিনাভি। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। দেশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের চাল-চলনকে ব্যঙ্গ করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১০৯. বলদ মহিমা—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

১১০. জয় মা কালী, কালীঘাটে একি চুরি—রাজরত্ন ॥ প্রকাশ

স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কালীঘাটের কালীর গয়নাচুরিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১১১. কি মজার কর্তা—শ্যামলাল চক্রবর্তী ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হিন্দুদের বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তির কুকীর্তিকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করে পুস্তিকাটি লিখিত। এই লোকটি কৃষ্ণনাম জপ করতো এবং এই সুযোগে সে মেয়েদের বিপথে টেনে নিয়ে যেতো। এইভাবে একবার সে হাতে নাতে ধরা পড়ে উত্তম-মধ্যম পেলো।

১১২. কলির বৌ হাড় জ্বালানি—হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। সমকালীন বাঙালী সমাজের পুত্রবধূদের স্বাধীন মনোভাব ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

১১৩. মাছে পোকা—বাদলবিহারী চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্বে উল্লিখিত হুজুগ নিয়ে এই বইটিও লেখা হয়েছে। বইটি নাট্যরীতিতে লেখা।

১১৪. বঙ্গমাতা—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

১১৫. যুবরাজের আগমনে জয়ধ্বনি—আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষে স্বাগত জানিয়ে ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে পুস্তিকাটি লেখা।

১১৬. যুবরাজ আগমন—ব্রজলাল সাহা ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২ + ১৭। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে এই বইটিও লেখা।

১১৭. ভারতে সুখ—হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতবাসীর আনন্দ পুস্তিকাটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

১১৮. উপহার—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে।

১১৯. যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্ড—লেখক অজ্ঞাত ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। যুবরাজের জীবনকথা বর্ণনা করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১২০. যুবরাজের অভ্যর্থনা—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। যুবরাজকে স্বাগত জানিয়ে এই বইটিও লেখা।

১২১. পঞ্চরং পাঁচালী—রজনীবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

১২২. ভারতে কুমার—নীলকান্ত গোস্বামী ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯। পূর্বে উল্লিখিত যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে পদ্যাকারে পুস্তিকাটি লিখিত।

১২৩. দুর্গাপূজা—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। দুর্গাপূজার আনন্দ উপলক্ষে পুস্তিকাটি রচিত।

১২৪. মণিহারা ফণী ভারত জননী—পার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বাংলার স্ত্রীসমাজের অসুখী অবস্থার বিবরণ দিয়ে পদ্যাকারে পুস্তিকাটি লিখিত।

১২৫. নূতন পোকা—জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একজাতীয় পোকা থেকে 'Kutmaria' নামে একরকম অসুখ হয়। সেই পোকা ও অসুখকে উপলক্ষ করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১২৬. নূতন রোগ—আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্ববর্তী পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু নিয়ে এই পুস্তিকাটিও রচিত।

১২৭. পদ্য কলিকা—ভুবনমোহন ভট্টাচার্য ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬।

১২৮. পদ্যমালা—উবাইদ্-অল্-হক ॥ প্রকাশস্থান—চেৎলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩।

১২৯. পদ্যপ্রবেশ—নদীয়াবাসী দাস ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২।

১৩০. পুলিস ঘাটের অগ্নিকাণ্ড—জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলভিনের ঘাটে (পুলিস ঘাট নামে পরিচিত) টর্পেডো বিস্ফোরণের ফলে যে ধ্বংস হয়, তার বিবরণ দিয়ে পুস্তিকাটি রচিত।

১৩১. কলির নবরঙ্গ—কালিদাস মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১। (পৃষ্ঠার দিক থেকে পথ-পুস্তিকা কিনা বিবেচ্য)। সমকালীন বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে।

১৩২. পুলিস ঘাটে হত্যাকাণ্ড—শ্রীমতী নিমুমণি দাসী ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলভিনের ঘাটে টর্পেডো বিস্ফোরণ ঘটিত অগ্নিকাণ্ডে কিছু প্রাণহানি হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৩৩. সুরা পিশাচী—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—চুঁচুড়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১। মদ্যপানের কুফলকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৩৪. বিষম সমস্যা—হুকচাঁদ ঘটকচুড়ামণি (বলা বাহুল্য ছদ্মনাম) ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এ দেশীয় যে-সব ব্যক্তি সমুদ্র পার হয়ে বিলেতে যান, এ দেশীয় সমাজপতিরা তাঁদের একঘরে করেন। এ-সব ব্যাপারে এ দেশীয় পণ্ডিতসমাজ ও সমাজপতিদের প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৩৫. মহাবন্যা—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। সমকালীন বন্যাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে বইটি।

১৩৬. ছেলের কি এই গুণ, স্ত্রীর জন্য মাকে খুন—কাশীনাথ বর্মা ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। এক যুবক এক সময় তার স্ত্রীর বিশ্বস্ততায় সন্দিগ্ধ হয়। সে তার মাকে গালাগালি দিয়ে বলে, তিনি নাকি বৌমাকে দেখে রাখতে পারেন না। অন্য পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও তিনি বন্ধ করতে পারেন না। রাগে ও ঘৃণায় মা এই অভিযোগ তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। বলেন, স্ত্রীর প্রতি তার বিশ্বাসহীনতার কোনো কারণ নেই। এতে যুবকটি অত্যন্ত চটে যায়। সে মাকে এমনভাবে মারে যে, মা তক্ষুনি মারা যান।

১৩৭. পূজার উৎসব—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০। (এটি পথ-পুস্তিকা কিনা বিবেচ্য)। দুর্গাপূজার উৎসবকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ

১৩৮. বাপরে কি বিষম ঝড়—হরিবন্ধু চক্রবর্তী ॥ প্রকাশস্থান—বরিশাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর যে ভীষণ সাইক্লোন হয়, তার ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত।

১৩৯. ভারত ভাগ্য—রাজকৃষ্ণ রায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ভারতে একদিকে যখন দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও দারিদ্র্যে সারাদেশ বিপর্যস্ত, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধিধারণকে ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে তাঁর সম্মানে পুস্তিকাটি পদ্যাকারে লেখা হয়েছে।

১৪০. কড়ির পুঁথি—আব্দুল আজিজ ॥ প্রকাশস্থান—শ্রীহট্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। টাকাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো জিনিস এবং তার অনেক ক্ষমতা—এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৪১. পদ্যমুকুল—গৌরভূষণ মজুমদার ॥ প্রকাশস্থান—আজিমগঞ্জ। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। কয়েকটি পদ্যের সংকলন-পুস্তিকা।

১৪২. পদ্যমুকুল—হরিমোহন খাসনবীশ ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পদ্যের সঙ্কলন।

১৪৩. পবনের অত্যাচার—নগেন্দ্রনারায়ণ রায়॥ প্রকাশস্থান—বরিশাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবরে যে ভীষণ সাইক্লোন হয়, তাতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ঝড়ের ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা।

১৪৪. ধন্য ইংরাজ রাজা—আনন্দচরণ দাস॥ প্রকাশস্থান—বরিশাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সুফল বর্ণনা করে গদ্যে পদ্যে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

১৪৫. পাক দিয়ে সুত লম্বা কর—মহেন্দ্রনাথ হালদার॥ প্রকাশ-স্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। মাতালদের নিয়ে লেখা গল্প পুস্তিকাটিতে স্থানলাভ করেছে। নামকরণ—যজ্ঞ দোহারের কণ্ঠে 'পার্বতীসুত লম্বোধর' শব্দগুচ্ছের বিকৃতি।

১৪৬. দুর্গাপূজা—হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। দুর্গোৎসবের বর্ণনা নিয়ে পদ্যে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

১৪৭. অকস্মাৎ বজ্রপাত—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৪৮. ভগবতীর হনুমান চরিত—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। দেবী দুর্গা এবং হনুমানের মধ্যে হাস্যরসাত্মক কথোপকথন এই পুস্তিকাতে রয়েছে।

১৪৯. হঠাৎ বাবু—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-অজ্ঞাত। মদ্যপানের কুফল এবং হঠাৎ বাবুয়ানাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৫০. মক্কেল মামা—নটবর দাস॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। সমসাময়িক কালে কলকাতা হাইকোর্টে একটি হিন্দু ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা চলে। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু তাকে নিয়ে। একজন ব্যক্তি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে তার নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে রত হয়। অবশ্য নাকি মামার প্রলোভনেই ভাগ্নী তার ধর্ম নষ্ট করে। মোকদ্দমাটি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের। ব্যক্তিটির নাম উপেন্দ্রনাথ বসু। সে তার ভাগ্নী ক্ষেত্রমণিকে ধর্ষণ করায় তার জেল হয়।

১৫১. মামা ভাগ্নীর নাটক—মহেশচন্দ্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু নিয়ে এই বইটিও লেখা।

১৫২. এবারকার অন্নমজা, দু তিনদিন দুর্গাপূজা—নগেন্দ্রনাথ সেন ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চারদিনের কম সময়ে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। এ বছরে চারদিনের চির পরিকল্পিত আনন্দ সময়াভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে—এটাই লেখকের বক্তব্য।

১৫৩. গরীব বেচারা—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—বহরমপুর। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১। (পথ-পুস্তিকা কিনা বিবেচ্য)। এর মধ্যে একটি করুণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ

১৫৪. পদ্দীর বেটা পদ্মলোচন—গোপালচন্দ্র মিত্র ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০। (পথ-পুস্তিকা কিনা বিবেচ্য)। দরিদ্রের ছেলে হঠাৎ বাবু হয়ে কীভাবে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় দিন কাটায়, পুস্তিকাটিতে রয়েছে তার বর্ণনা।

১৫৫. কালের কি কুটিল গতি—রামপদ ভট্টাচার্য ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। সমকালীন সমাজের বিভিন্ন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে লেখা।

১৫৬. ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। যারা কুরুচিপূর্ণ আনন্দে মত্ত, তাদের একদিন শাস্তি পেতে হবেই। চারজন বাবু ধরনের যুবক নিজেদের সভ্যতার বড়াই করতো। তারা ইংরিজী ছাড়া কথা বলতো না, এবং তাদের চাল-চলনও ছিলো সম্পূর্ণ বিলিতী। তারা মদ্যপান করতো এবং নির্লজ্জের মতো মাতলামি করে বেড়াতো। শেষে একদিন তাদের পুলিশে ধরে এইভাবে তারা জব্দ হয়। পুস্তিকার বিষয়বস্তু এই কাহিনী।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ

১৫৭. ননদ ভাইবোর ঝগড়া—হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। সাংসারিক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙালী সংসারে ননদ ও ভ্রাতৃবধূর যে চিরন্তন বিরোধ, তাকেই ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে এই পুস্তিকায়।

১৫৮. কলির কুলাঙ্গার—হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। একটি নব্যযুবককে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। সে সব সময়েই নিজেকে জঘন্য আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতো। এমন কি, একদিন তার মা মারা যাচ্ছে; তখনও সে ইয়ারদের নিয়ে স্ফূর্তি করে। কুলগুরু তাকে কিছু উপদেশ দিতে গিয়ে যাচ্ছে তাই ভাবে অপমানিত হন।

১৫৯. পাজীর বেটা ছুঁচো—উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। যেমন পিতা তেমনি পুত্র। পেজোমিতে পিতা বা পুত্র কেউই কম চলেন না। পুত্রের অকর্মকুকর্মে পিতা প্রশ্রয় দিয়ে চলে। পুত্রটি আবার লম্পট। এই লাম্পট্যবৃত্তির সহায়তা করে যারা—অর্থাৎ যারা মেয়ে মানুষ যোগাড় করে দেয়—তাদেরও সে প্রতারণা করতে অভ্যস্ত। পরিচিত প্রতিবেশীকে আক্রমণ করা হয়েছে সম্ভবতঃ।

১৬০. বিজয়া—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬। পুরাণভিত্তিক হাস্যরসাত্মক রচনা।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬১. দুর্গাপূজার মহাধূম—কৃষ্ণচন্দ্র পাল ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। দুর্গোৎসব এবং তার জাঁকজমক বর্ণনা করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৬২. বাবার ছেলের মা—শশাঙ্কবিহারী গুহ ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। বাঙালী পরিবারের একটি নারীর দুর্দশা পুস্তিকাতে চিত্রিত হয়েছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ

১৬৩. কার মরণে কেবা মরে মলো মাগী কলু—বনোয়ারীলাল গোস্বামী ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কতকগুলো মাতাল বাঙালীবাবু একবার মড়া পোড়াতে শ্মশানের দিকে যায়। পথ চলতে চলতে তাদের মদ খাওয়াও অবিরাম চলতে থাকে। শেষে নদীর ধারে এসে তারা ভাবে, মদের উপযুক্ত চাট্ এই মৃতদেহ দিয়ে বেশ ভালো করে বানানো যায়। তারপর তারা ঐ মৃতদেহটা আগুনে ঝল্‌সিয়ে মাংসগুলো কামড়ে কামড়ে খেয়ে শেষ করে। ঠিক সেই সময়ে এক কলু-বৌ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে দেখামাত্র মাতালরা সবাই মিলে তাকে মেরে ফেলে এবং তাকেও এরা ঝল্‌সিয়ে নিয়ে চাট্ বানায়। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে মদ্যপান এবং তার কুপরিণতি দেখাবার উদ্দেশ্যেই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

১৬৪. শাশুড়ী জামাই—শম্ভুনাথ বিশ্বাস ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু একটি কাহিনী। কাহিনীটি এই রকম : এক অর্থপিশাচ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলো। তার স্ত্রী আগেই মারা গেছে। একটিমাত্র কন্যা আছে। ব্রাহ্মণ তার বিয়েও দিয়েছে একজন যুবকের সঙ্গে। যুবক বিদেশে থাকবার জন্য তার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতে রাখতে বাধ্য হয়। কিছুদিন সে বাপের বাড়ী থাকে। যুবকের এই অনুপস্থিতির সুযোগে ব্রাহ্মণ তার কন্যার আবার একটি বিয়ে অন্যত্র

দিয়ে আবার কিছু পণ গ্রহণ করে। পণের টাকা সে প্রচুর পেলো। টাকা পেয়ে খুশি হয়ে ব্রাহ্মণ বুড়ো বয়সে আর একটা বিয়ে করলো। স্ত্রীটি তরুণী। ইতিমধ্যে তার মেয়ের আগেকার স্বামী ফিরে আসে। সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায়। পরে সবকিছু জানতে পেরে সে চটে যায়। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় সে বুদ্ধি খাটিয়ে তার নতুন শাশুড়ীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সুন্দরী যুবতী শাশুড়ী যুবক-জামাইয়ের সঙ্গে ঘর করতে অনায়াসেই রাজী হয়।

১৬৫. ফচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা—শম্ভুনাথ বিশ্বাস॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একজন বৃদ্ধের একটি তরুণী স্ত্রী ছিলো। সে ব্যভিচারিণী হয়ে একটি উপপতি জুটিয়েছিলো। তার সঙ্গে তরুণীটি প্রায়ই মিলিত হতো। বৃদ্ধ তার প্রমাণ পেয়ে হাতে নাতে লোকটিকে ধরে ফেলবার জন্য এবং শাস্তি দেবার জন্য বারবার বুদ্ধি খাটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃদ্ধের চতুরা স্ত্রী বারবার তার ফন্দি ভেস্তে দেয়। এটাই পুস্তিকাটির কাহিনী।

১৬৬. প্রণয় বিচ্ছেদ—মনোরঞ্জন বসু॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একটি কাহিনী পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু। স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্বেও এক ব্যক্তি অত্যন্ত লম্পট ছিলো। একসময় যখন তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে তাকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন সে আত্মহত্যা করলো।

১৬৭. মায়ের আদুরে মেয়ে—অঘোরচন্দ্র ঘোষ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। মায়ের অত্যন্ত প্রশ্রয় পেয়ে একটি মেয়ে কি রকম উচ্ছৃঙ্খল হয়, তার বিবরণ পুস্তিকাটির মধ্যে আছে।

১৬৮. পূজাতে সাজা মজা—রামনারায়ণ হাজরা॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। দুর্গোৎসবের বিষয়কে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে। যাদের স্ত্রী সাধ্বী এবং স্বামীকে যারা ভালোবাসে, তারাই দুর্গাপূজোতে আসল আনন্দ পেয়ে থাকে। কিন্তু যাদের পয়সা অল্প এবং যাদের স্ত্রী শুধু বিলাসিতা এবং গয়নাগাঁটি ভালোবাসে, তারা এই পূজোতে শুধু যন্ত্রণাই পেয়ে থাকে। তাদের কাছে পূজোর আমোদ-আমোদ নয়, দুঃখ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ

১৬৯. কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। পুত্রবধূরা পরিবারে প্রবেশ করে যৌথ পরিবার প্রথার ক্ষতিসাধন করে এবং যৌথ পরিবারকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়; তারই বিবরণ পুস্তিকাটিতে আছে। বাবা মারা যাবার পরও দুই ভাই একই সঙ্গে ছিলো। তারপরে একে একে তারা দু'জন বিবাহ

করলো। বড়ো ভাইয়ের স্বার্থপর স্ত্রী বড়ো ভাইকে এমনভাবে বশীভূত করলো যে, স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই বড়োভাই ছোটোভাই আর তার স্ত্রীকে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলো।

১৭০. অসৎ কর্মের বিপরীত ফল—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। অতিরিক্ত মদ্যপান করে একটি লোক কীভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলো। তারই বিবরণ পুস্তিকাটিতে রয়েছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ

১৭১. যৌবনের ঢেউ—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। দুটি বাঙালী স্কুলের ছাত্র। বাইরে তারা ভালো বলে পরিচিত; এবং সকলে জানে যে, পড়াশোনায় তারা খুব মনোযোগী। কিন্তু তারা গোপনে একজন বিধবা তরুণীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু এই কাহিনীটি।

১৭২. কলির মেয়ে ও নব্যবাবু—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। প্রগতিশীলা এক বাঙালী তরুণী তার সামাজিক, নৈতিক এবং পারিবারিক সবকিছু বিধি-নিষেধের ওপরেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতো। সে সব ব্যাপারেই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও সুখকেই গুরুত্ব দিতো। সবাইকে সে ঘৃণা করতো এবং সর্বদাই নিজেই সুখের জন্য নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতো। স্বামীর প্রতি দাসীর মতো আনুগত্যকে সে কুসংস্কার বলে মন্তব্য প্রকাশ করতো। বাবুটিও কম যান না। তিনি শুধু মদ খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানতেন কিনা সন্দেহ। অন্য সবার কোনো ব্যাপারই তাঁর মনঃপূত হতো না। লেখক স্বামী ও স্ত্রী—উভয় চরিত্রকেই অপছন্দের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

১৭৩. কলির ছেলে—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। কলির ছেলে অর্থ—কু-শিক্ষিত বাঙালী যুবক। এরা সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হয়ে সাহেবের দোষগুলি নকল করে। বাবা-মাকে এরা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করে না। এদের নিজস্ব কোনো ধর্মমত নেই, অথচ অপরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এরা উপহাস করে। এদেরই একজনের চরিত্রকে একটি কাহিনীর মধ্যে দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ

১৭৪. এমন কর্ম আর করব না—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯। পুস্তিকাটির কাহিনী এ রকম : তিনজন নব্যবাবু বেশ্যালয়ের কাছাকাছি এক শুঁড়িখানায় গিয়ে গণ্ডগোল জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে তাদের ধরে

নিয়ে যায়। তারা তখন প্রতিজ্ঞা করে, এমন কর্ম তারা আর জীবনে কোনো দিনও করবে না।

১৭৫. ফচ্‌কে ছুঁড়ীর ভালবাসা—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। একটি তরুণী অসতী স্ত্রী কী করে ব্যভিচার করতো, পুস্তিকাটিতে তারই বর্ণনা আছে।

১৭৬ কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার যার আছে পয়সা কড়ি—চুনীলাল শীল॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এক শ্বশুর আশা করতেন, জামাই 'নজর' হাতে শ্বশুরবাড়ী আসুক। কিন্তু জামাই আসে শূন্য হাতে; কারণ 'নজর' দেবার তার কোনো ক্ষমতা ছিলো না। এতে শ্বশুর চটে গিয়ে তার সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করেন। যুবকটির অসতী স্ত্রী তখন বাপেরবাড়ী ছিলো। তারই প্ররোচনার যুবকের শ্যালকরা সবাই মিলে যুবকটিকে মারধোর করে বিদেয় করে দেয়।

১৭৭ ভালবাসার মুখে ছাই—লালবিহারী সেন॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। চারটি স্কুলের ছাত্র কী করে বেশ্যালয়ের কাছে এক শুঁড়িখানায় গিয়ে গোলমাল শুরু করে এবং কাভাবে পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যায়। সেই কাহিনীটিই পুস্তিকাটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

১৭৮. নাতিন জামাই—হরিহর নন্দী॥ (২য় সংস্করণের প্রকাশ কাল জানা যায়)। প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১৭৯. ছোট বৌর গুপ্ত প্রেম—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (?)॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কুফলের বিষয় নিয়ে বইটি লেখা। ছোটো বৌ শিক্ষিত এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু তার এই শিক্ষা শেষে তাকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করেছে।

১৮০. ঘিয়ের সাতকাণ্ড—নীলমণি শীল॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ঘিয়ে ভেজাল নিয়ে এই সময়ে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) এক প্রচণ্ড আলোড়ন হয়। ঘি পূজা-আর্চায় দেবতাকে হোমে আহুতি দেওয়া হয়, এ হেন দ্রব্যে ভেজাল ধর্মপ্রাণ ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে বিচলিত করেছিলো। পুস্তিকাটি এই বিষয় নিয়ে লেখা।

১৮১. ঘিয়ের গন্ধে প্রাণ গেল—এস্. এন্. লাহা॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্ববর্তী পুস্তিকাটির বিষয় নিয়েই এটি লেখা।

১৮২. বুড়ো পাগলার বে—এস্. এন্. লাহা॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে গিয়ে একটি লোক কেমন করে জব্দ হয়েছিলো, পুস্তিকাটির মধ্যে তা বর্ণিত হয়েছে।

১৮৩. পিরীতের বাঁদর নাচ—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (?) ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একজন স্ত্রৈণ ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর কথায় তার অসুস্থ মাকে অবহেলা করতো, খোঁজ খবর নিতো না। কিন্তু অন্যদিকে স্ত্রীর মন যোগাবার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না একদিন সে তার স্ত্রী ও বন্ধুদের আমোদ দেবার জন্য বানরের সাজে সজ্জিত হয়ে নাচতে আরম্ভ করে। এটিই এই পুস্তিকার কাহিনী।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৪. রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (?) ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। অসমবিবাহকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। বিষয়বস্তুর বিস্তৃত পরিচয় অজ্ঞাত।

১৮৫. অসৎ কর্মের বিপরীত ফল—হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একই লেখকের একই নামের পুস্তিকাটির অনুরূপ বিষয়বস্তু কিনা জানা যায় না। তবে দুই পৃষ্ঠা বেশি বর্তমান পুস্তিকাটি বহন করছে।

১৮৬. মাতাল সন্ন্যাসী—ওয়াহেদ্ বক্স ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯। ধর্মধ্বজের দুরাচারকে কেন্দ্র করে সম্ভবত পুস্তিকাটি রচিত।

১৮৭. আজব জোলা—চন্দ্রকান্ত দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। জোলা সম্প্রদায় সমাজে অত্যন্ত হীনস্তরের অন্তর্ভুক্ত। একবার এই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হঠাৎ খুব বড়োলোক হয়ে ওঠে। সে বাবুয়ানা ও বিলাসিতা দেখায়। একবার সে তার শ্যালকের কন্যাকে বিবাহ করবার চেষ্টা করে এবং অপদস্থ হয়। মনে হয় কাহিনীটির মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ রয়েছে।

১৮৮. গোপালমণির স্বপ্নকথা—এস্. এন্. লাহা ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতা নিয়ে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

১৮৯. শান্তমণির চূড়ান্ত কথা—মণিলাল মিশ্র ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এই বইটিও স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতা নিয়ে রচিত।

১৯০. এক ঘরে দুই রাঁধুনি পুড়ে মলো ফ্যান গালুনি—রাধাবিনোদ হালদার ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

১৯১. দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ—রাধাবিনোদ হালদার ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বহুবিবাহ ও দাম্পত্য বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

১৯২. যুগীর পৈতে রঙ্গ—শ্রীনাথ লাহা॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। উপবীত গ্রহণের রীতি হিন্দুসমাজের উচ্চতম বর্ণের মধ্যে প্রচলিত। পরে আভিজাত্য অর্জনের জন্য উচ্চবর্ণের অনেকে উপবীত গ্রহণ করে। কিন্তু যোগী সম্প্রদায় হিন্দুর বর্ণ কাঠামোর বাইরের ধাপে পড়েন। তাঁদের উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে—অন্ততঃ পুস্তিকাটি পড়লে তা মনে হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৯৩. শিখছ কোথা? ঠেকেছি যথা—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশ-স্থান ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। স্কুলের ছাত্রদের মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে পুস্তিকাটি লিখিত। একটি ছাত্র কী ভাবে জব্দ হয়ে অবশেষে সুপথে যাবার জন্য সঙ্কল্প করেছিলো, তারই কাহিনী এই পুস্তিকাটির মধ্যে রয়েছে। (বিস্তৃত কাহিনী অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

১৯৪. পাশকরা জামাই—রাধাবিনোদ হালদার॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পুস্তিকাটির কাহিনী এইরকম: কেদারনাথ বি-এ পাশ দিয়েছে। এখন সে সাহেবী চালে চলে। অনেক কষ্টে ধার করে তার বাবা তার পড়াশোনার খরচ যুগিয়েছেন। তাঁর আশা ছিলো, কেদার 'পাশ' দিলে বিয়ের বাজারে তার দাম বাড়বে এবং মেয়ের বাপের কাছ থেকে তিনি বেশ মোটা টাকা আদায় করতে পারবেন। ননীগোপাল নামে এক ভদ্রলোক অবশেষে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হন এবং তাঁর মেয়ের সঙ্গেই কেদারের বিয়ের ব্যবস্থা হয়। তারপর একদিন বিয়ে হয়। প্রথা অনুযায়ী বিয়ের রাত্রে বরকে বাসর ঘরে কনের প্রতিবেশিনী মেয়েদের মধ্যে কাটাতে হয়। সেখানে গান-বাজনা ঠাট্টা-তামাসা চলে। পাশ করা জামাই উগ্র মেজাজের। সে এইসব 'অর্থহীন' 'কুরুচিপূর্ণ' তামাসা পছন্দ করে না। শেষে এক সামান্য কারণে সে বাসর ঘরের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে পালায়। অর্থলোভী বাপ বেয়াইয়ের সামনে অপদস্থ হন।

১৯৫. কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ হইতে সোনার টালি পতনে কলির অবতার—আর. এন্. সরকার॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। এই সময়ে বাংলাদেশে একটা গুজব রটেছিলো যে, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ থেকে একটা সোনার টালি এসে পড়ে। তাতে নাকি লেখা ছিলো (ভগবান কোন্ ভাষায় লেখেন?) যে, শিগ্‌গিরই বিষ্ণু নাকি অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং নাস্তিকদের শাস্তি দেবেন।

১৯৬. ঠক্ বাছতে গাঁ উজাড়—শৈলেন্দ্রচন্দ্র সরকার॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। বর্তমান যুগে সকলেই প্রতারক—অনেকটা এই মতবাদ নিয়ে লেখা একটি কাহিনী পুস্তিকাটিতে আছে।

১৯৭. মা মাগীর গলায় দড়ি, বৌয়ের হাতে সোনার চুড়ি—হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রৈণ পুত্রের দুর্ব্যবহারে মায়ের দুরবস্থার কথা পুস্তিকাটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

১৯৮. কলিকালের রসিক মেয়ে (১নং?)—হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতাকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে।

১৯৯. আর কি বলদ গাছে ধরে—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বিষয়বস্তু জানা যায় না।

২০০. শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়া—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বলা বাহুল্য শাশুড়ী ও পুত্রবধূর চিরন্তন বিরোধ নিয়েই পুস্তিকাটি রচিত।

২০১. পিরীতের মুখে ছাই—হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

২০২. কলিকালের প্রেমের রঙ্গ, বেশ্যা নিয়ে রঙ্গ-ভঙ্গ—হারাণশশী দে॥ বেশ্যাসক্তি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিভিন্ন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে।

২০৩. প্রণয়ের ভালবাসা—হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ

২০৪. তোমার উচ্ছন্নে যাবার সুরু—মতিলাল শীল॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

২০৫. কলিকালের রসিক মেয়ে (২নং?)—হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। ইতিপূর্বে একই লেখকের একই নামের আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী কাগজপত্রে দুটি পুস্তিকা হিসেবেই নথিভুক্ত হয়েছে।

২০৬. কলির হঠাৎ অবতার—মোহনলাল মিশ্র॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

২০৭. কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই বইটি প্রকাশের একটি তারিখ সরকারী নথিতে আছে। একই লেখকের একই নামের ভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু পুস্তিকা

আছে। বর্তমান পুস্তিকাটি সেই ধরনের কিনা অথবা পুনর্মুদ্রণ, তা বোঝা যাচ্ছে না।

২০৮. নাতিন জামাই—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সরকারী নথিতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি তারিখও পাওয়া যায়। এই বইটি সম্পর্কিত সমস্যা পূর্ববর্তী বইটির মতোই।

২০৯. ননদ ভাইবো'র ঝগড়া—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। সরকারী নথিতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের একটি তারিখ পাওয়া যায়। সমস্যা পূর্ববৎ।

২১০. ঘোড়ার ডিম—হরিহর নন্দী॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। অনেকে বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে বক্তৃতা করেন, বড়ো বড়ো কথা বলেন। অথচ কাজের সময় পিছিয়ে যান। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ব্যাপারেও এই ধরনের কিছু মানুষ ছিলেন। তাদেরই ব্যঙ্গ করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। (কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২১১. প্রাণের জ্বালা—গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়॥ প্রকাশস্থা৹—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

২১২. বেল্লিক বামন—গোবর্ধন বিশ্বাস॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এক পুরুৎ ঠাকুর বাইরে খুব নিষ্ঠা দেখান, কিন্তু আসলে তিনি অত্যন্ত লম্পট স্বভাবের ছিলেন। একটি সুন্দরী মুসলমান মেয়েকে হস্তগত করবার চেষ্টা করতে গিয়ে কীভাবে তিনি জব্দ হলেন, পুস্তিকাটিতে তা বর্ণিত হয়েছে।

২১৩. সাতশো রগড়—বিপিনবিহারী দে॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

২১৪. লম্পটের নাকে খৎ—গুরুদাস বৈরাগী॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। একজন লম্পট ব্যক্তি দুষ্ক্রিয়া করতে গিয়ে কীভাবে জব্দ হয়েছিলো, তারই কাহিনী সরসভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২১৫. রসিক কামিনীর হদ্দমজা, রথ দেখা আর কলা বেচা—মোহনলাল মিশ্র॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতার কাহিনীকে রসিকতার দৃষ্টিকোণে বিবৃত করা হয়েছে পুস্তিকাটিতে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ

২১৬. মাইরি দিদি!—কুসুমেষুকুমার মিত্র॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

২১৭. সকলি শুধায়—রমেশচন্দ্র নিয়োগী ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এক ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত, মদ্যপ এবং অত্যাচারী। লোকটি অবশেষে একজন উৎসাহী সাধুর প্রভাবে পড়ে। সাধু তাকে ভক্তিরহস্য শিক্ষা দেন। শেষে দেখা যায়, লোকটি একজন হরিভক্ত ও সৎলোক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২১৮. ডাক্তারবাবু—রাজকৃষ্ণ রায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। এক ডাক্তারের বৃত্তিগত দুর্নীতি এবং লাম্পট্যকে কেন্দ্র করে এই পুস্তিকাটির কাহিনী পরিকল্পনা। অবশেষে ডাক্তার আক্কেল লাভ করেন। (কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২১৯ বেলুনে বাঙ্গালী বিবি—রাজকৃষ্ণ রায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। এক ব্যক্তির স্ত্রৈণতা এবং তার স্ত্রীর যথেচ্ছাচারিতার কাহিনী এই পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। (কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২২০. খোকাবাবু—রাজকৃষ্ণ রায় ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্ববর্তী পুস্তিকারই নায়ক অর্থাৎ স্ত্রৈণ ব্যক্তিটির যথেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর প্রশ্রয়ে পুত্রটিও কেমন 'আব্দারে' হয়, তারই কাহিনী এই পুস্তিকাটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। (কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ

২২১. বানরের গলায় হীরার হার—হাজারীলাল দত্ত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। অসম-বিবাহকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত।

২২২. বড়বাবু—নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

২২৩. প্রেম সাগর—ওয়াহেদ্ বক্স ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ

২২৪. নানাবিধ গান—কুশাই সরকার ॥ প্রকাশস্থান—ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সমাজবিষয়ক ও প্রেমবিষয়ক কিছু গান বইটির মধ্যে আছে।

২২৫. নদের চাঁদ—প্রমথনাথ দাস ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

২২৬. পূজার রোশনাই—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। দুর্গাপূজার উৎসবকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ

২২৭ বসন্ত উৎসব—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—বগুড়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ

২২৮. কৌলীন্য মহিমা—প্যারীশঙ্কর গুপ্ত॥ প্রকাশস্থান—'বোগরা' (বগুড়া)। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কৌলীন্যপ্রথা ঘটিত দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা।

২২৯. কপালের লেখা—যোগীন্দ্রনাথ ভাস্কর॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

২৩০. মাগমুখো ছেলে—এস্. বি পাল॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। কাহিনীটি এইরকম : একজন প্রগতিশীল যুবকের স্ত্রীও শিক্ষিতা। স্ত্রীটি পরিবারের সকলের কাছেই দুর্বিনীত ছিলো। এমন কি স্বামীকেও সে ভৃত্যের মতো গণ্য করতো। এই স্ত্রীর প্ররোচনায় তার স্বামী তার নিজের বাবাকে অত্যন্ত পীড়ন করতো এবং স্ত্রীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতো। লেখকের বক্তব্য এই যে, এই ধরনের স্বভাব আজকাল অধিকাংশ যুবকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

২৩১. প্রেমের কামড়—শরৎচন্দ্র দাস॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। অবৈধ প্রেম যে মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে, এই মত প্রকাশ করে একটি কাহিনী পুস্তিকাটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

২৩২. এ মেয়ে পুরুষের বাবা—শরৎচন্দ্র দাস॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একটি বৃদ্ধ কেমন করে তার অসতী স্ত্রী দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলো, তার একটি কাহিনী নিয়ে পুস্তিকাটি লিখিত।

২৩৩. দশ আনা ছ আনা—শরৎচন্দ্র দাস॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। দুটি যুবক একটি বাক্স চুরি করে। বোঝাই মালে দশ আনা ছ আনায় ভাগ করবার জন্য তারা স্বীকৃত হয়। কিন্তু অবস্থা বিপাকে তাদের জেল হয়। একজনের—যার দশ আনা ভাগ—তার দশ মাসের জেল; এবং অন্যজনের—যার ছ আনা ভাগ—তার হয় ছয় মাসের জেল। পুস্তিকাটিতে এই কাহিনী দেওয়া হয়েছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

২৩৪. আমি হিন্দুমতে সাহেব হব, হ্যাটকোট পরে সদাই রব—শশিভূষণ অধ্যায়॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সাহেবিয়ানার প্রতি

অত্যন্ত আকর্ষণ, অন্যদিকে নিজের সমাজ ও ধর্মকে ছাড়বার ব্যাপারে ভীরুতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২৩৫. মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা—হরিপদ ভট্টাচার্য (?) ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯। পুস্তিকাটির কাহিনী এই-রকম : একজন শিক্ষিতা স্ত্রী তাদের দাম্পত্য জীবনে সন্তুষ্ট ছিলো না। তাই সে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হলো। সে তার উপপতিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য একদিন তার নিজের স্বামীকে হত্যা করলো। কিন্তু এ কাজ করে পরে তার হয় অনুশোচনা। বিবেকের দংশনে কাতর হয়ে সে আত্মহত্যা করে। মরবার আগে সে বলে যায়—সব মা বাবাকে, তাঁরা যেন কখনো তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়া না শেখান।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

২৩৬ প্রেম নাটক—মান্নালাল মিশ্র ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

খ্রীষ্টাব্দ অজ্ঞাত (উনিশ শতাব্দী)

২৩৭. হাড় জ্বালানি—গোলাম হোসেন ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। হুগলী জেলার বন্দীপুর নিবাসী শ্রীসেখ জমিরদ্দীর আদেশ অনুসারে রচিত। প্রতিষ্ঠাকামী স্ত্রীর নির্দেশে স্ত্রৈণ স্বামী কেমন করে তার নিজের মাকে নিপীড়ন করে এবং দুর্দশায় নিয়ে যায়, সেই কাহিনী এই পুস্তিকায় দেওয়া হয়েছে। (বিস্তৃত কাহিনী অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২৩৮ পুরু নজর—কালু মিঞা ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। 'নীতিশিক্ষামূলক কিতাব'। একজন মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবন কাটাতে গিয়ে শেষে কী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ালো, সেই বিপর্যয় দেখানো হয়েছে একটি কাহিনীতে। কৃতঘ্নতা, চৌর্যবৃত্তি ও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে লেখকের মনোভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে। (বিস্তৃত কাহিনী অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২৩৯. সোমত্য মাগীর সখ—ছিদ্দিক আলি ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২৪০. রাতে উপুড় দিনে চিৎ ছোট বউর একি রীত—কালু মিঞা ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রী রাতে অর্থাৎ স্বামী সান্নিধ্যে উপুড় অর্থাৎ অনিচ্ছুক এবং দিনে অর্থাৎ স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার একজন ভাবের মানুষের সান্নিধ্যে চিৎ অর্থাৎ ইচ্ছুক।

২৪১. রং সোহাগীর আজব ঢং—ছিদ্দিক আলি ॥ প্রকাশস্থান—

অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। একজন তরুণী স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২৪২. কোঁৎকা—সেখ মণিরদ্দী॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। এক লম্পট ব্যক্তি কীভাবে জব্দ হয়েছিলো সেই কাহিনী পুস্তিকাটিতে আছে।

২৪৩. ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। প্রগতিশীল দলের বাবুয়ানাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত।

২৪৪. হরির লুট—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

২৪৫. হঠাৎ জ্ঞান—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-অজ্ঞাত। এক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির আক্কেল লাভকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

২৪৬. সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। এক ব্যক্তির দর্পচূর্ণের কাহিনী নিয়ে লেখা এই পুস্তিকাটি।

২৪৭ যমের মায়ের গঙ্গাস্নান—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। হাস্যরসাত্মক কল্পিত পুরাণ কাহিনী এর বিষয়বস্তু।

২৪৮. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

২৪৯ বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। একটি স্বৈরিণীর জীবনকে কেন্দ্র করে রসাত্মকভাবে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২৫০. বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনায় প্রাণ যায়—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচারের বর্ণনা এই পুস্তিকাটির মধ্যে আছে।

২৫১. প্রেম করা বিষম দায়—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। অবৈধ প্রেমের সমস্যা ও পরিণতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

২৫২. প্রবাসে পতি কি দুর্গতি—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। পতিবিচ্ছিন্না একাকিনী স্ত্রীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

২৫৩. পাড়াগেঁয়ে একি দায়, ধর্মরক্ষার কি উপায়—লেখক অজ্ঞাত॥

প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। পল্লীগ্রামের বিভিন্ন দুর্নীতি ও সমস্যা বর্ণনা করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

২৫৪. ধান ভানতে শিবের গীত—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

২৫৫. ছাই ফেলতে ভাঁয়া কুলো—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

২৫৬ ঘোর কলি—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। সমকালীন পুরুষ ও স্ত্রী-সমাজের ব্যাপক দুর্নীতি ও অনাচারকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

২৫৭ ঘোর ইয়ার—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। সমকালীন সমাজে মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি এবং তার সঙ্গে মোসাহেবদের দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

২৫৮ ঘরের কড়ি দিয়ে মদ খায়, লোকে বলে মাতাল—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। মদ্যপানকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত।

২৫৯. কেউ কারু নয়—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।

২৬০. উরোৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গেলরে বাপ—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।

২৬১. অবাক কলি পাপে ভরা—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। সমাজের স্ত্রীপুরুষের দুর্নীতি ও অনাচারকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা।

[অনেক পুস্তিকায় পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি, কারণ গ্রন্থকার সংগৃহীত কাগজপত্রে সংখ্যাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কোনোটির পৃষ্ঠা সংখ্যা অবশ্য আদৌ পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেগুলি যে এক ফর্মার বই, এ-বিষয়ে গ্রন্থকার নিঃসন্দেহ। এগুলির মধ্যে ঢাকা থেকে কয়েকটি বই প্রকাশ পেয়েছে।]

॥ সংযোজনী ॥

'সংযোজনী' হিসেবে আরও কতকগুলি পথ-পুস্তিকার নাম দেওয়া হলো। এখানেও গ্রন্থকার সবগুলিকেই 'পথ-সাহিত্য' বলে রায় দিতে অনিচ্ছুক। অনুমানভিত্তিকভাবে এই তালিকা প্রদত্ত হলো।

২৬২. মাতাল গতি—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। মদ্যপায়ীকে কেন্দ্র করে লেখা। (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত)।

২৬৩. পারদারিক ফল—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। পরস্ত্রী সংক্রান্ত দোষের প্রতিফল বর্ণনা করে লেখা।

২৬৪. জামাইষষ্ঠী—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ১২৯০ সালে প্রকাশিত। বিষয়বস্তু বলা বাহুল্য জামাইষষ্ঠী সংক্রান্ত।

২৬৫. জামাই ঘরের ছেলে—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। জামাইয়ের শ্বশুরগৃহ সর্বস্বতাকে কেন্দ্র করে লেখা। ১২৯০ সালে প্রকাশিত।

২৬৬. আদর্শ গৃহিনী—পার্বতীসুন্দরী বসু॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। (রচনা কাল—?)

২৬৭. কোনের বউ—সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯। ১২৯৬ সালে প্রকাশিত। (অন্তর্ভুক্তি বিবেচ্য।)

২৬৮. সুরাপান কি ভয়ঙ্কর—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫। (রচনা কাল—?)

২৬৯. বল মা তারা দাড়াই কোথা—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। (রচনা কাল—?)

২৭০. আদিরস কাব্য—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। (বিষয়বস্তু অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২৭১. কুমার কামিনী—লেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৭২. বষ্টম বউ—হরিমোহন কাঠভূষণ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। (বিষয়বস্তু অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২৭৩. সোহাগ—গোঁসাইদাস সরকার॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। ১২৮৫ সালে প্রকাশিত।

২৭৪. ভবরোগের টোট্‌কা—মণিমোহন রক্ষিত॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯। ১২৯৩ সালে প্রকাশিত। (বিষয়বস্তু অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

২৭৫. দু কান মলা—প্যারীমোহন হালদার॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৭৬. কি মজার শনিবার—চন্দ্রকান্ত শিকদার॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—অজ্ঞাত। ১২৭৭ সালে প্রকাশিত।

২৭৭. ত্রয়স্পর্শ বিবাহ—হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী ॥ প্রকাশস্থান—টালিগঞ্জ (কলকাতা)। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত।

২৭৮. আহমক নামার পুথি—কামার অল্ দীন ॥ প্রকাশস্থান—কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। সম্ভবতঃ বোকাদের বোকামির গল্প পুস্তিকাটিতে স্থান পেয়েছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৭৯. মানকুঞ্জ—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। ১২৯০ সালে প্রকাশিত।

২৮০. বিজয়া—কৃষ্ণলাল সরকার ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত।

২৮১. দুর্গোৎসব—ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৮২. মধুর চুম্বন—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। বিষয়বস্তু-রোমান্স। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৮৩. হায় কি সর্বনাশ—দ্বারকানাথ মিত্র ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮। বিষয়বস্তু জানা যায়নি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২৮৪. মহারাণী—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। ১২৯১ সালে প্রকাশিত।

২৮৫. বড় মজার কথা—জামালউদ্দিন ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। ১২৯৩ সালে প্রকাশিত।

২৮৬. আগমনী—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭। ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

২৮৭. বিজয়া—লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭। ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

২৮৮. সঙ্গীত লহরী—অবিনাশচন্দ্র মিত্র (সংগৃহীত) ॥ প্রকাশস্থান—অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিচিত্র সঙ্গীতের সংগ্রহ। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত।

পরিশিষ্টে অল্পপৃষ্ঠার কতকগুলি বইয়ের তালিকা দেওয়া হলো। এগুলির মধ্যেও দুই একটি পথ-পুস্তিকা লুকিয়ে থাকতে পারে।

কয়েকটি পথ-পুস্তিকার প্রসঙ্গ (১৯শ শতাব্দী)

কিছু কাহিনীর দৃষ্টান্ত :

॥ কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ॥

কন্যাপণের বিরুদ্ধে লেখক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। পুস্তিকাটির কাহিনীর মধ্যে কন্যাকর্তার অর্থলোভের দিকটি চিত্রিত হয়েছে।

রায়মশায়ের মেয়ে ডাগর হয়েছে। রায়মশায়ের ইচ্ছে, মেয়েটিকে এই সময় বিয়ে দিয়ে কিছু টাকা রোজগার করবেন। তিনি পাত্রাপাত্রের বিচার করতে চান না। তাঁর মত,—

"লেখাপড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন।
বেশী পণ যেবা দিবে সুপাত্র সে জন ॥"

ঘটকরা মাঝে মাঝে এসে পাত্রের খবর দেন; কিন্তু দরে পোষায় না। রায়মশায় বলেন,—"আজকাল একটা আঁতুড়ে মেয়ের দর কত। আঁতুড় খরচ আর এই যে এগারো বছর খাওয়ানো গিয়েছে, তাতে কি কম খরচ হোয়েছে? লোকে আমাদের পাটাবেচা বামুন বলে, কিন্তু তলিয়ে বুঝে না, যে কত ধানে কত চাল হয়। আপনারা যে কোরবো টাকা দিয়ে, আবার মেয়ের বিয়েও যদি টাকা দে দিব, তবে আমাদের দশা কি হবে?" ঘটক বড়ালমশাইকে রায়মশায় বলেন,—"মোশায়! আমাদের ঘরের একটি মেয়ে পাবার তরে কত লোক মুব্যে থাকে, কত লোক আগামী দুশো-একশো টাকা বায়না দে রাখে, আমরা ভরদ্বাজী রায়, আমাদের ঘরে মেয়েরা প্রায়ই মা-গোঁসাই হয়, কেমন সুখে থাকে।" তিনি অহঙ্কারের সঙ্গে বলেন,—"আমাদের ঘরে মেয়ে একটু ডাশিয়ে না উট্‌লে আমরা বেচিনে। আমরা তো হাঁড়ী চড়িয়ে থাকিনে যে গো-ডিম বেচবো!"

শেষে এক পাত্র জোটে। বয়সে খুবই বৃদ্ধ। তবে সে নাকি রায়মশায়কে আটশো টাকা পণ দেবে। রায়মশায় ভাবেন, এ টাকা হাতে পেলে এ অঞ্চলে তিনি একজন 'গণ্যমান্য' মানুষ হবেন। তিনি মতলব আঁটেন, বিয়ের খরচা তিনি পাঁচ-সাত টাকার মধ্যে সেরে দেবেন। বিয়ের রাতে বর, বামুন, পরামাণিক আর দুজন বরযাত্রী। চিঁড়ে-দই খাওয়ালে কতোই বা খরচা হবে।

এই সম্বন্ধটা অবশ্য রায়গিন্নির পছন্দ হয় না। অসমবয়সীর বিয়ে সুখের হয় না। তাছাড়া আর একটা পাত্র তাঁর পছন্দ হয়েছিলো। পাত্রটি ওকালতী পড়ে এবং বয়সেও যুবক। কিন্তু দেড়শো টাকার বেশি পণ সে দিতে পারবে না। অতএব রায়মশায়ের কাছে পাত্র অযোগ্য। তিনি বলেন,—"সে উকিলী শিখ্‌চে, উকিলদিগের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক কোত্তে আছে! কোতা থেকে পাচিল ডিংগে উত্তরাধিকারী হোয়ে যথাসর্বস্ব নে বস্‌বে। হাউড়ি। উকিলকে কি আমি জামাই কোত্তে পারি?"

বিয়ের দিন। বর এসে বসে। প্রতিবেশীরা ভাবে, তামাসা করে বুঝি বরের ঠাকুর্দা টোপর মাথায় দিয়ে বসেছে। বরকে দেখে কনের মা রায়গিন্নী ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে,—"ওরে বাবারে কি হোল রে, আমাদের মিনসে আমার মেয়ের হাতে পায়ে দড়ী বেঁধে জলে ফেলে দিচ্চে।" এই সময় কতকগুলো মাতাল এসে 'শিবের বিয়ে' বলে নন্দী ভৃঙ্গী সেজে উৎপাত আরম্ভ করে। মাতালদের মধ্যে বরের ছেলেও ছিলো। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, বাপের বিয়ে দেখতে নেই। সে আড়ালে চলে যায়। তবে তার বন্ধুরা উৎপাত চালিয়েই যায়। ঘটক এসে যখন তাদের মাতলামির নিন্দে করে, মাতালদের একজন তখন ঘটককে বলে,—"আমি মদ খেয়ে যে অমানুষতা করছি, তুমি তার চেয়েও যে বেশি করছ।"

বর দেখে রায়গিন্নী একেবারে বেঁকে বসেন। মেয়েকে তিনি এমন বুড়ো বরের হাতে দিতে পারবেন না। চটে গিয়ে রায়মশায় গিন্নীকে বলেন—"তোর বাপের মেয়ে যে আটকে রাখছিস? আব বাগান বাঁধা আছে, উদ্ধার করতে হবে।" গৃহিনী প্রতিবাদ করে বলেন, মেয়েটি রায়মশায়েরও বাপের নয়। শেষে রায়মশায় নরম হয়ে গিন্নীকে বলেন,—"টাকাগুলো তুমিই নাও, আমার মান রাখ।" টাকার গন্ধে গিন্নীর মন গলে যায়। চোখের জল মুছে গিয়ে হাসি ফুটে ওঠে। কনের মা তখন কাঁদতে কাঁদতে টাকার পুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত হয়।

॥ কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে—সেখ আজিমদ্দী ॥

মৃত্যুগামী এক বুড়োর হঠাৎ বিবাহ-বাসনা জাগে। তার প্রচুর বিষয়-আশয়। কিন্তু সে ভাবে, স্ত্রীই যদি না থাকে, তাহলে শুধু বিষয়ের আনন্দে কি সুখ হবে। বুড়োর স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গেছে।

অনেকদিন পর তার বেয়াইয়ের সঙ্গে দেখা। বেয়াইকে সে দুঃখ করে বলে যে, বাড়ীতে সে একা। মরবার আর বেশি দেরী নেই। মৃত্যুকালে কে তার মুখে জল তুলে দেবে! সুতরাং এ অবস্থায় তার একটা বিয়ে করা উচিত। বেয়াই তাই শুনে বাড়ীতে এসে বুড়ীকে বলে যে, বেয়াই বিয়ে করতে চায়। বুড়ী বলে,—"যমদূতে যে

যে বুড়োর ঘাড় ধৃত করিয়াছে কেবল ভাজিতেই বাকী রাখিয়াছে। তাহার বিবাহ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, যেমত ব্যাঙ্গের গায় জ্বর ও কুম্ভীরের সন্নিপাত।"

সব কিছু শোনবার জন্য বেয়ান বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়োর কাছে যায়। বুড়ো বলে,—"এ বয়সে অপরালয়ে গমনাগমনের অযোগ্য হইয়াছি। লোকে দেখিলে সহজেই মন্দ বলিবেক।" বুড়ীর মনে সন্দেহ জাগে। সে বলে,—"তুমি এ বয়সে বিবাহ করে বণিতাকে কি আমার স্বামীকে দিয়ে যাবে, তাই বুঝি তুই বেহাই যুক্তি স্থির করিয়াছ।" ঝাঁটা হাতে নিয়ে বুড়ী বুড়ো বেয়াইকে মারবার ভয় দেখায়। বুড়ীকে প্রসন্ন করবার জন্য তখন বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো বলে,—"এ বিয়েতে বুড়ো নতুন বৌকে যে গয়না পরাবে, বেয়ানকেও তাই এক প্রস্থ দেবে।" গয়নার লোভে বুড়ী বেয়ান ভাবে,—"তা মন্দ কী! অলঙ্কার যদি দেয় দিক না।"

বুড়ী তখন উদযোগ করে অর্থলোভী এক গৃহস্থের রূপসী ষোড়শী কন্যা সৌদামিনীর সঙ্গে বুড়ো বেয়াইয়ের বিয়ে দেয়। সৌদামিনী ভাবে বিয়ে করা মানে বিধবা হওয়া—এর চেয়ে কুমারী থাকা বরং ভালো। সে কান্নাকাটি করে। কিন্তু এক হাজার সোনার মোহর পণ দিয়ে কনেকে বুড়ো বিয়ে করে নিয়ে যায়।

শয্যায় বুড়ো কনেকে স্পর্শ করতে গেলে সে সর্বাঙ্গে কাপড় ঢেকে পড়ে থাকে মড়ার মতো। বুড়ো অনেক সাধ্যসাধনা করেও শেষে ব্যর্থ হয়। এইভাবে দিন যায়।

কিন্তু বুড়ো কিছুদিন পরেই মারা গেলো। তখন এক ব্যবসায়ী পুত্রের সঙ্গে বুড়োর বৌ সৌদামিনী ভ্রষ্টা হলো।

॥ শিখছ কোথা? ঠেকেছি যথা—হরিহর নন্দী ॥

অভয় স্কুলের ছাত্র। কিছু-সংখ্যক ইয়ারের দল জুটিয়ে সে মদ্যপান করে এবং গণিকাগৃহে যাতায়াত করে। ইয়ারের দল সকলেই স্কুলের ছাত্র। তবে পিতার অসাক্ষাতে এবং অগোচরেই অভয় এ-সব করে। পিতা অবশ্য কিছু কিছু বুঝতে পারেন। তাঁর ধারণা, অভয়ের বন্ধুবান্ধবরাই অভয়কে নষ্ট করছে।

ক্ষীরদা, হরিদাসী, ফুংনী, স্বর্ণ, কিরণ, পান্না, মোক্ষদা ইত্যাদির সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে এবং নিজেদের ষোলোশো গোপিণীর কৃষ্ণ ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। বুদ্ধিতেও এরা কম যায় না। অশ্বিনী বলে, আজকাল বাড়ীর বার হওয়া মুস্কিল, কারণ বাড়ীর লোকেরা টের পেয়েছে। তখন নব বুদ্ধি দেয়,—"তুমি একটু স্টুপিড্, বল্লেই হবে যে, আমি উমুক বাসায় পড়া বুঝতে গিয়েছিলাম।"

অধঃপতনের সূত্রপাত বন্ধুদের নিয়েই হয়। পরে বন্ধুদের আর দরকার পড়ে না। গোপী অভয়ের বন্ধু। কিন্তু এখন সে অভয়ের সঙ্গ ছাড়াও কুকর্মে পটু। সে, আর দুই

বন্ধু—গৌর ও ব্রজরাজকে নিয়ে গণিকাগৃহ থেকে মাঝরাতে ফিরছিলো। গণিকা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। গোপী তার ওপর আক্রোশ প্রকাশ করতে করতে ফেরে। বন্ধুরা সুবুদ্ধি দেয়,—ওখানে গোলমাল করতে গেলে লোক জানাজানি হবার সম্ভাবনা, সুতরাং চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঢাকার ইসলামপুরের পথে রাত দুটোর সময় দুই দলের দেখা হয়। গোপী অভয়ের পুরানো বন্ধু। অভয়কে সে বলে,—"শুনতে পাই, তুমি স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাসা হতে বের হও, সমস্ত দিন হরিদাসীর বাড়ীই পড়ে থাকে।" অভয় যে গোপীর চেয়েও কম যায় না—এটা বোঝাবার জন্য ওকে হরিদাসীর বাড়ী নিয়ে চলে। শুধু হাতে গণিকাগৃহে যেতে নেই ; কিন্তু এতো রাত্রে মদ কোথায় পাবে ? চারদিকে পাহারাওয়ালা আছে। অভয় বলে,—"সেজন্যে ভেবোনা, টাকা দাও দিচ্ছি।"

গোপী রাস্তার মাঝেই গান আরম্ভ করে। পাহারাওয়ালা এসে তাল ভেঙে দেয়। বলে,—"বাবু দারু পিও মজা করো, চুপ করকে চলা যাও আপনা।" পাহারাওয়ালার সঙ্গে অভয়রা রসিকতা শুরু করে দেয়। অভয় বলে,—"আরে বাবা, চলে যাব না কি বসে থাকব, আমরাও ত ট্যাক্স দিই। মদ খেয়ে যদি একটু আমোদই না করতে পারব, তবে অনর্থক পয়সা খরচ করে খাওয়ার লাভ কি ? তুমিই বিবেচনা কর।" বেরসিক পাহারাওয়ালার অতো বিবেচনাশক্তি ছিলো না। সে বলে,—"রেণ্ডি বাড়ীমে যাও, দারু পিও, মজা করো, সড়কে ক্যা ?" এমন সময় সার্জন (সার্জেণ্ট) আসে। ওদের সবাইকে সে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে। অশ্বিনী আক্ষেপ করে,—"খেলেম না ছুঁলেম না, মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গে পুলিশে যেতে হল।" অভয় বলে,—"কেন বাবা, বার বাড়ী যেতে পার, আর ব্রাণ্ডি গিলতে পার, পুলিশে যাবার বেলায় মার্গ ফাটে।" অশ্বিনী, নগেন্দ্র আর গৌর প্রতিজ্ঞা করে, এদের দলে আর মিশবে না। অভয় তখন বলে,—"মাতালের প্রতিজ্ঞা ডাল-ভাত কালই বুঝা যাবে।"

যা হোক, পাহারাওয়ালাকে অনেক বলে কয়ে দু'টাকা দিয়ে তারা ছাড়া পায়। পাহারাওয়ালা বলে,—"দেও রূপায়া দেও, বাবু আট ভাগ হোগা।" অভয়ও অবশেষে চৈতন্য লাভ করে। বলে,—"আর না, অন্য যথেষ্ট শিক্ষা পেলেম। শিখছ কোথা ? ঠেকেছি যথা।"

॥ ঘোড়ার ডিম—হরিহর নন্দী ॥

লেখকের বক্তব্য :

"সংস্কারক বলে যেই লোকের কাছে কয়।
কার্যকালে পাছে হাটে সেই মহোদয়॥

আপনাগুণ সভার কাছে করেন সুখ্যাতি।
কার্যের নামে ঠন্ঠনাঠন্ কেবল যুক্তি গুতা গুতি ॥"

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক কিংবা সমাজ সংস্কারক হিসেবে অনেকেই বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, কিন্তু কাজের সময় তাঁরা পিছিয়ে যান। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে মাণিক সভাসমিতিতে মেতে ওঠে। প্রচার পত্র পড়িয়ে বেড়ায়। "শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর দুঃখে কাতরতা, অটল অধ্যবসায় ও অক্লান্ত শ্রমশীলতা-গুণে এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের কৃপাদৃষ্টিতে হিন্দুবালা বিধবাদিগের চির দুঃখ বিমোচনের পথ উন্মুক্ত ও নিষ্কণ্টকিত হইয়াছে।...এক্ষণে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মতে পুনর্বিবাহ হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন।" গোবর্ধনের সঙ্গে মাণিকের দেখা হয়। গোবর্ধনকে সে বলে, এ ব্যাপারে আসছে শনিবার "পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে" একটা মিটিং হবে। গোবর্ধন মাণিককে জিজ্ঞাসা করে—সে কোন্ পক্ষে? মাণিক জবাব দেয়,—"আমার আর পক্ষাপক্ষ কি? যেদিগে জয়, সেই দিগেই আমি।" গোবর্ধন বলে,—যাদের স্বামী নিরুদ্দিষ্ট বা যারা স্বামী পরিত্যক্তা—তাদেরও পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। মাণিক একথা সমর্থন করে। গোবর্ধন বলে,—"ইহা ব্যতীত দেশের উন্নতি হইবার কোন পথ নাই, এই দেখুন ইংরাজেরা বিদেশী, তথাপি আমাদের দেশের হিতের জন্য কতদূর করিতেছেন।"

আন্দোলনের প্রচার খুব চলছে। বিধবাদের মধ্যে একটা আশা জেগে ওঠে। এবার তাদের বিয়ে হবে ভেবে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। কামিনী মনমরা হয়েছিলো। রাজলক্ষ্মী তাকে এই খবর দিলে কামিনী উল্লসিত হয়ে ওঠে।

মিটিং নিয়ে অনেক প্রচারের পর শনিবার যথাস্থানে যথারীতি মিটিং বসে। প্রচুর জন সমাবেশ। দীনদয়াল রায় বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন নিয়ে বক্তৃতা করবেন। তিনিই এই সভার সভাপতি। সভাপতি দীনদয়ালবাবু উঠেই বক্তৃতার মধ্যে বললেন,—মৌখিক সংস্কারক হয়ে কোনো ফল নেই। যার যে বিধবা আত্মীয়া আছেন তাদের বরং বিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। এ-সব শুনে একে একে শ্রোতাদের আসন শূন্য হতে শুরু করে। শেষে দেখা যায়—সভাগৃহ শূন্য। মাণিক এসব দেখে বলে, —"ঘোড়ার ডিম! কেবল সভাই সার! যাহারা মুখসর্বস্ব দেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা কার্যে কিছুই না।"

॥ ডাক্তারবাবু—রাজকৃষ্ণ রায় ॥

শ্যামপুরের নিতাই মুদী ধার্মিক, কিন্তু ব্যবসায়ে পোক্ত। বাবাজীকে, নেড়ানেড়ীকে এক আনা পর্যন্ত দেয়, অথচ আধপয়সার মুনও ধারে ছাড়ে না। একটা ক্ষুধার্ত ছোট মেয়ে

একটু মুড়ি চাইলে, সে তাকে দিয়ে পাকা চুল তুলিয়ে তারপর মুড়ি দেয়। কালীচরণ নিতাইয়ের আত্মীয়। সে এসে খবর দেয়, নিতাইয়ের দাদা গৌর প্রায় মরো মরো। গৌর থাকে প্রায় আটক্রোশ দূরে জগৎপুর গ্রামে। নিতাই এ গাঁয়ের ভজহরি কোবরেজের কথা তোলে। সে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। তাকেই নিয়ে যেতে হবে। হাতুড়ে জয়-ডাক্তার দেখ্ছে। তাকে বিশ্বাস নেই। কালীচরণকে নিয়ে নিতাই কোবরেজের বাড়ী পা বাড়ায়।

ভজহরি কোবরেজ চণ্ডীমণ্ডপে বসে রোগী দেখছে। একজনের মাথা ধরেছে। তাকে ভজহরি বলে,—"হু, এ দেখছি গন্ধর্বরাজ সান্নিপাতিকের লক্ষণ, এ রোগে যমদণ্ড-প্রহার মোদক ব্যবস্থেয় ...যমদণ্ড-প্রহার মোদক আমার প্রধান ঔষধ, এর অপর নাম সর্বজীবয়।" দামের কথায় ভজহরি বলে—"হাতে রেখে বলবো না ঠিক বলবো?" ভজহরি কথাটা বুঝিয়ে বলে,—"ওরে বাবু! কবিরাজ, বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিমেরা টিপ রেখে রোগীর চিকিৎসা করে। যে রোগটা এক তিল তাকে তাল করে রোগীর অর্থ-শোষণ করে। আবার যে রোগটা আটআনা বা এক টাকার ঔষধ খেয়ে সাতদিনে সেরে যেতে পারে, সে রোগটাকে তিন-চার মাস ওষধ খাইয়ে হপ্তায় হপ্তায় টাকা লোটে, একেই বলে হাতের টিপ।" শেষে কোবরেজ রোগীকে ওষুধ দেয়—একটাকা পাঁচআনা নিয়ে। আর এক রোগীর পা ফুলেছে। অসুখ যখন পায়ের, তখন হাতের নাড়ী টিপে লাভ নেই বলে কোবরেজ পা টিপে দেখে। তারপর বলে, রোগী নিশ্চয়ই দইয়ের সঙ্গে ঘোল মিশিয়ে খেয়েছে! কোবরেজের অনুমান প্রায় ঠিক বলে রোগী স্বীকার করে আর বলে যে, সে দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে খেয়েছে। কোবরেজ বলে,—ও একই কথা। "বিষস্য বিষ-মৌষধম" বলে দুধে ঘোল মিশিয়ে খাবার নির্দেশ দিলো কোবরেজ। সে তাকে একটা বড়িও খেতে দেয়—" পঙ্গু চূড়ামণি বটিকা।" শুকনো শালপাতার রসের সঙ্গে মেড়ে খাওয়াতে হবে। শুকনো শালপাতা থেকে রস বার করবার কথায় রোগী অবাক্ হলে ভজহরি বলে, দু আনা ধরে দিলে সে নিজেই সেই রস বার করে দিতে পারবে। শুকনো থেকে রস নিঙ্ড়ে বার করা তার কৃতিত্ব, পেশাও বটে।

নিতাই এসে ভজহরিকে তার দাদার অসুখের কথা বলে। ভজহরি বলে,—"গো-বদ্দি গো-ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে কি রোগ ঠাওরানো যায় বাপু? আমি ভিন্ন অন্য কে তন্ন তন্ন করে রোগ ঠাওরাতে পারে?" যাহোক অনেক ধরা কওয়ার পর কোবরেজ ষোল আনার জায়গায় পৌণে ষোল আনা নিতে রাজী হয়। শ্যামপুর থেকে জগৎপুর আট ক্রোশ। স্বতন্ত্র পাল্কী ভাড়া এবং দর্শনী, সেই সঙ্গে ওষুধের খরচা—সব নিয়ে সে পনেরো টাকা চায়। নিতাই বলে, টাকার জন্য ভাবনা নেই, রোগ ভালো হবে তো? ভজহরি গর্বের সঙ্গে বলে, তার ওষুধে রোগী অরোগী—সবাই সারে।

এদিকে জগৎপুরে একটি ঘরে নিতাইয়ের ভাই গৌর যন্ত্রণায় কাতরায়। তার স্ত্রী নিস্তারিণী তাকে হাওয়া করে। জয় ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিলো। জয় ডাক্তার আসে। নিস্তারিণী আড়ালে যায়। ডাক্তারকে দেখে গৌর মুখভঙ্গী করে যন্ত্রণা জানালে জয় ভাবে, তাহলে তার ওষুধ লেগেছে। গৌরকে মেরে ফেললে নিস্তারিণী তার বশে আসবে। পাশের ঘরে নিস্তারিণীকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুনে জয় ডাক্তার মনে মনে ভাবে,—"এইবার ও আমার ফাঁদে পড়েচে। ধন্য আমার ডাক্তারী শিক্ষা। ধন্য ইংরাজের মেডিকেল কলেজ স্থাপন!" গৌরের নাড়ী দেখে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে জয় একটু জোরে হাঁক দিয়ে বলে,—"ইস্, তাই তো, বড় গোলযোগ যে। ওগো, ও ঘরে আছ তো শোন, গতিক বড় ভাল নয়, এই এখন সন্ধ্যে, বোধহয় ৯টা দশটার মধ্যেই—তাইতো, আহা, লোকটা বড় ভাল ছিল।" ডাক্তার যাবার ভান করে। নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ডাক্তারের পায়ে পড়ে। ডাক্তার ভাবে,—"উঃ! ছুঁড়ী কি সুন্দরী, যেন অপ্সরী! মুখখানি যেন টলটলে পদ্মফুল, ঘোমটা ফুটেও আভা বেরুচ্ছে; চোখ দুটি ফুটে জল বেরুচ্ছে, আমার চোখে বোধ হচ্চে যেন ফোটা পদ্মে শিশির বিন্দু।" নিস্তারিণীকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে ডাক্তার তাকে তার উদ্দেশ্য জানায়। "তুমি বড় সুন্দরী, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি যদি আমাকে তার শতাংশের একাংশও ভালবাস, তাহলে আমি আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে পাই।" এ কথায় নিস্তারিণী ভয়ে লজ্জায় আরো ফুঁপিয়ে কাঁদে। ডাক্তার তখন তার হাত ধরতে যায়। সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। ঠিক এমন সময় নিতাই আর কালীচরণ ভজহরি কোবরেজকে নিয়ে এই বাড়ীতে ঢোকে। বাইরের দরজায় নিতাইদের গলা শুনে ডাক্তার ভয় পেয়ে ঘরের তক্তপোষের তলায় আত্মগোপন করে। নিতাই ঘরে ঢুকে বড় বৌকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে তার চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান করায়। জ্ঞান পেয়েই নিস্তারিণী প্রলাপের ঘোরে অত্যন্ত ভয়ের স্বরে বলে ওঠে,—"ডাক্তারবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছুঁয়ো না।" একটু ধাতস্থ হবার পর নিস্তারিণী তার করুণ কাহিনী এদের কাছে শোনায়। নিতাই খুব রেগে যায়। তক্ষুণি সে ডাক্তারের খোঁজ করে। পালাবে কোথায়। বাইরের পথে তো তারাই আছে। ঘরে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়েছে। তবে পালিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। ভজহরি মন্তব্য করে,—"তা আশ্চর্য নয় বাপু, ডাক্তারগুলো সবই পারে; ওরা যখন বোতলের ভিতর থেকে হাওয়া বার কোত্তে পারে, তখন নিজেরাও যে বেমালুম হাওয়ায় মিশে যাবে, তার সন্দেহ কি?" হঠাৎ জয় ডাক্তার তক্তপোষের তলা থেকে হেঁচে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তক্তপোষের তলায় ডাক্তারকে দেখে নিতাই আর কালীচরণ তাকে টেনে বার করে। তারপর চলে অবিশ্রান্ত গালিগালাজ এবং ক্রমাগত মার। মারের চোটে জয় ডাক্তার বলে,—"দোহাই নিতাই আমার ঘাট হয়েছে। আমায় মাফ্

কঁদ; আর এমন কর্ম করবো না, আমি তাঁন হাতে কোরে গু খেয়েচি।" নিতাই তাকে নাথৈ খং দেওয়ায়। নিতাইয়ের কথায় নিস্তারিণীকে জয় ডাক্তার 'মা' বলে ডাকতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়। গৌরকে জয় ডাক্তার বাবা বলে ডাকে, নিতাইকে খুড়ো বলে ডাকে, আর কালীচরণকে বোনাই বলে ডেকে তারপর রক্ষা পায়। তখন নিতাই তাকে লাথি মেরে ঘর থেকে বার করে দেয়। জয় ডাক্তার আক্ষেপ করে বলে,—"আজ আমার যেমন কর্ম, তেমনি ফল! সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ পদাঘাত। আমা মতন যারা তারা সাবধান হও।"

॥ বেলুনে বাঙ্গালী বিবি—রাজকৃষ্ণ রায় ॥

খোকাবাবু দয়ালের আদুরে ছেলে। স্ত্রৈণ দয়াল স্ত্রীর ভয়ে খোকাবাবুকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন। খোকাবাবু যখন যা গোঁ ধরে যেন তেন প্রকারেণ তা করা চাই-ই। নইলে প্রলয় ঘটবে। খোকাবাবুর ইচ্ছাপূরণের জন্য দয়ালের দুই মোসাহেব ফেলারাম ও মনসারাম নাস্তানাবুদ।

কলকাতায় বেলুন নিয়ে খুব হৈ চৈ চলছে। স্পেন্সার সাহেব নিজে বেলুন নিয়ে আকাশে উঠবেন। সকলের মুখেমুখে এক কথা। এমন কি বাউলরা বেলুন নিয়ে গানই বেঁধে ফেলে,—

"বেলুনবাজ সাহেব ভায়া, বেলুনে তুলবে কায়া,
উড়বে খুব লাগিয়ে হাওয়া, লুটবে টাকা পাই ॥"—ইত্যাদি।

একদল বাউল বেলুনের গান করতে করতে চলছিলো। জিজ্ঞাসা করে খোকাবাবু জানতে পারে, এরা হলো বাউল। কিন্তু খোকাবাবু নিজের বুদ্ধিতে চলে। সে বলে, —না, ওরা বাউল নয়, ওরাই বেলুন। ফেলারাম মনে মনে বলে,—"ওঃ, ছেলে যেন বুদ্ধির জাহাজ, এইবার দেখ্‌চি, লাটসাহেব না একে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির ফাইলোলজিকাল্ ফেলো বানিয়ে দেন!" খোকাবাবু বুঝতে পারে, ফেলারাম তার কথায় কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। সে রেগে গিয়ে বলে,—"আমার কথা ঠিক নয়? বল্, নৈলে নদ্দমায় ঠেলে ফেলে দেবো।" ফেলারাম বিনীতভাবে বলে,—কলকাতায় তো নর্দমা আজকাল নেই! খোকাবাবুও হারবার পাত্র নয়। তার বাবার কাছে গিয়ে সে তক্ষুণি আব্দার ধরে—এক্ষুণি একটা নর্দমা খুঁড়ে দেবার জন্য। দয়াল বলেন, নর্দমা ধাঙড়েরা খোঁড়ে। খোকা বলে, তবে ফেলারাম খুঁড়ুক। দয়ালরা বলে, মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বাররা খুঁড়তে দেবে না। খোকাবাবু তখন বাবাকে ধরে, তাঁর সঙ্গে জুড়ী গাড়ী চড়ে সে মেম্বারদের বাড়ী যাবে। খোকাকে ভোলাবার জন্য দয়াল বলেন, তার চেয়ে জুড়ী চড়ে টিভলি গার্ডেনে চলুক। "সেখানে আজ বেলা ৫টার সময়

পার্সিভাল স্পেন্সার সাহেব বেলুনে চোড়ে, আকাশে উড়ে প্যারাস্যুট ধরে লাফিয়ে পড়বে।" এবার খোকা গোঁ ধরলো, সে বেলুনে চড়বে। দয়ালবাবু বিপদে পড়েন। এর চাইতে নিজের হাতে নর্দমা খুঁড়ে দেওয়া ভালো ছিলো। ফেলারাম দয়াল সম্বন্ধে চুপিচুপি মন্তব্য করে,—"ঢের ঢের পুরুষ দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন মেগের বশ পুরুষ কখনো দেখি নি—দেখব না। গিন্নী যদি আঁচল নাড়ে, কত্তা অম্নি উল্টে পড়ে। যে পুরুষের মেগো-রোগ, তার ভাগ্যে নরক ভোগ।"

কিন্তু এদিকে খোকা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়; অধৈর্য প্রকাশ করে। বেলুন কেনা চাই-ই। যতো টাকা লাগে লাগুক। মেজাজ যখন তার চরমে ওঠে, তখন তার মুখ থেকে অদ্ভুত রকমের হিন্দী বাৎ প্রকাশ পায়। সে আসল বেলুন না পেলে ক্ষতি নেই, ঘুড়িওয়ালার কাগজের বেলুনই নেবে! তাও যদি না জোটে, তবে ছবির বেলুন নেবে। খোকাবাবুর তর সয় না হাতের ছড়ি দিয়ে সে ফেলারাম ও মনসারামকে মারতে থাকে। তারা পালায়। থাকেন একা দয়াল। খোকাবাবুর রাগটুকু সব দয়ালের ওপর গিয়ে পড়ে। সুতরাং দয়ালকেও ছড়ির ঘা খেতে হয়। খোকাবাবুকে কিছু বলার সাহস দয়ালের নেই। তিনি বলেন,—"তোমার মাকে বলো, তিনি যদি তোমায় বেলুন চড়তে বলেন, তাহলে স্পেন্সার সাহেবের কাছ থেকে বেলুন কিনে নিয়ে আসবো।"

এদিকে দয়ালের অন্দরের ছাদে দয়াল-গিন্নী দূরবীণ নিয়ে বেলুন দর্শনে ব্যস্ত। খোকাবাবু কাঁদতে কাঁদতে মাকে গিয়ে বলে,—"হয় বেলুন চড়বে সে, নয় তো মাথা কুটে মরবে।" "আহা ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস" বলে গিন্নী তাকে আদর করেন। কিন্তু অধৈর্য খোকা মাথা কুটবার ভান করে এবং চীৎকার করে গলা ফাটায়। গিন্নী দয়ালকে ভর্ৎসনা করে বলেন,—"কাঁচা ছেলে মাথা খুঁড়ে কেঁদে মারা গেলো, তুমি মন্দারাম হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো। শীগ্‌গির ছেলেকে কোলে তোলো, নৈলে দূরবীণ ছুঁড়ে তোমারো মাথা কানা কোরে দেবো।" দয়াল আজ্ঞা পালন করেন।

তারপর গিন্নী বলেন, খোকার বেলুনে না ওঠাই ভালো। কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন,—"বাঙ্গালী পুরুষ বেলুনে উড়লে বাঙ্গালীরে তাকে উৎসাহ দেয় না, বরং নিরুৎসাহ করবার জন্যে ঠাট্টা বট্‌কিরে করে। তার সাক্ষী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেচারী প্রাণের মায়া ভুলে, আত্মীয় স্বজনের মায়া ভুলে, বাঙ্গালী জাতকে উঁচুতে তোলার জন্যে বেলুনে চোড়ে উঁচুতে উঠলো, কিন্তু কটা বাঙ্গালী বাহবা দিলে, দু' দশ টাকা দিয়ে সাহায্য কোল্লো? আর ওদিকে স্পেন্সার সাহেব এক পলকে বাঙ্গালীর কাঁছাবাঁধা লুকনো টাকাও টেনেটুনে লুটে নিয়ে চল্লো। বাহারে বাঙ্গালী! সাহেবের ফাঁকির বাঙ্গালী!" এবার খোকা মাকেই বেলুনে উঠতে বলে। মা তো আর পুরুষ নয়, মেয়ে। সুতরাং মায়ের চড়তে আপত্তি কী? গিন্নী বলেন,—"যা বলেছিস্ খোকা, তা

ঠিক। এখনকার কালে সবি বিপরীত। পুরুষ মেয়ে, মেয়ে পুরুষ। তাতে আবার তোর বাবার কাছে একটু একটু ইংরিজি পড়েচি। ইংরেজের দেশে বিবিতেও বেলুনে চোড়ে ওড়ে… তবে কি দোষ কল্লে ইংরিজি পড়া বাঙ্গালী বিবি?"

গিন্নী তখন একটা গ্যাসভরা বেলুন বাগানে এনে ঠিক করে রাখতে হুকুম দেয় দয়ালকে। দয়ালকে অবাক হবারও অবকাশ দিলেন না তিনি। মনসারাম ভাবে,— "বড়মানুষের মাগ, সুঁন্দর বনের বাঘ। ওরা কি না পারে? দু' দশ হাজার পুরুষকে এক হাটে কিনে আবার সেই হাটেই বেচতে পারে।"

বেলুন প্রস্তুত হয়। গাউন পরে নিশান হাতে বিবি এসে বেলুনে চড়েন। গিন্নী যদি উড়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হন, এই ভয়ে দয়াল দাঁড় ধরে থাকেন—যদিও গিন্নীর এতে অনেক আপত্তি ছিলো। বেলুন উড়তে আরম্ভ করে। গিন্নী উড়তে উড়তে "হুর্‌রে" আওয়াজ করেন। এদিকে দড়ি টানাটানি করতে করতে দয়ালরা কাহিল হয়ে পড়েন।

॥ খোকাবাবু—রাজকৃষ্ণ রায় ॥

দয়াল একজন সচ্ছল গৃহস্থ। তাঁর সঙ্গে সর্বদা খেলারাম আর মনসারাম নামে দু'জন মোসাহেব ঘুরে বেড়ায়। দয়াল তাঁর স্ত্রীকে যমের মতো ভয় করেন। তাঁর একটা ছেলে আছে, সবার কাছে খোকাবাবু নামেই পরিচিত। গিন্নী তাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে বেপরোয়া আর খামখেয়ালী করে তুলেছে। সে যা ইচ্ছে করে, সেটা কার্যকরী করবার জন্য মোসাহেবদের—এমন কি স্বয়ং দয়ালেরও চেষ্টার অন্ত নেই। অনেকটা গিন্নীর ভয়েই এসব হয়, খোকাবাবু যদি হুকুম তামিল হয় নি বলে তার মার কাছে অনুযোগ করে, তাহলে দয়াল চোখে অন্ধকার দেখবে। দয়াল যখন খোকাবাবুর আদেশকে এতো গুরুত্ব দেন, তখন মোসাহেবরা তো দেবেই। খোকাবাবুর অনুরোধেই একদিন দয়ালকে মোসাহেবদের দিয়ে কাছা খোলাতে হয়। এমন কি খোকাবাবুর অনুরোধে একদিন মোসাহেব মনসাকে মনিব দয়াল নিজের কাঁধে নিতে বাধ্য হন।

বাইরে সাহেবরা তাঁবু ফেলেছে। সেখানে তারা শোয়। তখন শীতকাল। খোকাবাবু আব্দার করে, সেও তাঁবুতে ঘুমোবে। দয়াল খোকাবাবুর এ ধরনের একটা ইচ্ছে শুনে হতভম্ব হয়ে যান। এমন সময় গিন্নী এসে দয়ালকে তাগাদা দেন, কেন দয়াল খোকাবাবুর ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। গিন্নী বিবিয়ানা পছন্দ করেন এবং খোকাবাবুর মতো চঞ্চল প্রকৃতির। তিনি বলেন, তিনিও তাঁবুতে ঘুমোবেন।

তক্ষুণি তেওয়ারীকে দিয়ে তাঁবুর জন্য বুলসাহেবকে চিঠি পাঠানো হয়। তাঁবুর জন্য প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচা হবে; দয়াল একটু চিন্তিত হলেও গিন্নীর ধমকে দয়াল বিনা আপত্তিতে পঞ্চাশ টাকা ধার করেন। ব্যাপার দেখে মালী ভাবে,—"বড় মানুষের খেয়ালি

ভাই ! আমরা একমাস খাটি পাঁচ টাকা মাইনে পাই, আর তাঁবুর বেলা একদমে পঞ্চাশ টাকা। সাহেব না হোলে বাঙ্গালী ঠকে কই ? বাঙ্গালী যেমন বুনো ওল, সাহেব তেমনি বাঘা তেঁতুল।"

খোকাবাবু বাগানবাড়ীতে এসেই এক-একটা আব্দার ধরে এবং ফলে চাকর মালী মোসাহেব—সকলেই নাকাল হয়। মোসাহেব মনসা বলে,—"পেটের জ্বালায় কত জ্বালাই সইতে হয়! আমার এমন ছেলে হলে কানে তালপট্‌কা গুঁজে আগুন দিয়ে মেরে ফেলতুম।"

তাঁবুতে গিয়ে হঠাৎ গাছের ওপর শব্দ শুনে খোকাবাবু জানতে পারলো যে এটা হনুমানের শব্দ। খোকাবাবু হনুমান দেখতে চায়। কিন্তু হনুমান ততোক্ষণে পালিয়ে গেছে। খোকাবাবু গোঁ ধরে—হনুমান সে দেখবেই। আসল হনুমানকে তো নিয়ে আসা যাবে না। তাই গিন্নীর আদেশে দয়ালকেই হনুমান সাজতে হয়। মালী হনুমানের মুখোস, তুলো আর কোৎরা [illegible] সংগ্রহ করে নিয়ে আসে [illegible] এনে লাগানো হয় দয়ালের পশ্চাদ্ দেশে।

গিন্নী লেজ ধরে দয়ালকে নাচাতে নাচাতে বললো,—"নাচ্‌রে আমার হনুমান, খেতে দেবো মর্তমান।" দয়াল লাফায়। নাচতে নাচতে দয়াল বলে,—"রাম! রাম! কপালে এতোও ছিল, ভ্যালা আদুরে ছেলে খোকাবাবু; ভ্যালা নেই-আঁকড়া মাগ! আমার মত যারা মেগের বশ, তাদের ভাগ্যে এম্‌নি যশ!"

॥ হাড় জ্বালানি—গোলাম হোসেন ॥

হাড়-জ্বালানী কলির বৌ কাজ করে না—চুপ করে বসে থাকে। অথচ বাসি কাজ অনেক জমা হয়ে আছে। শাশুড়ী সেটা মৃদুভাবে জানালে কর্কশভাবে বৌ জবাব দেয়, শাশুড়ীর গিন্নীপনা তার কাছে অসহ্য। ক্ষুব্ধ শাশুড়ী বলেন, তাঁর আয়ু বেশিদিন নেই, বৌয়ের সংসার বৌ-ই বুঝে নিক। শাশুড়ীর মরণের কথায় বৌ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মরণ কামনা মুখে প্রকাশ করে। শাশুড়ীকে বলে,—"আমি স্পষ্ট বলি শুন, আমি বাবু তোমাকে আর ভাতে রাখ্‌তে পারবো না, তুমি আপনার দেখেশুনে খাও গে।" পুত্রবধূর কথায় শাশুড়ী মর্মাহত হন। বলেন,—"বুড়ো বয়সে তিনি কোথায় এখন ভিক্ষা মেগে খেতে যাবেন!" বৌ জবাব দেয়,—"ভিক্ষা মেগে খাবে কি কাটনা কেটে খাবে তা আমি কি জানি, কিন্তু আমার কাছে হবে না।" শাশুড়ী স্থির করেন, বিদেশে ছেলে আছে, তার কাছে চিঠি দেবেন। সে সেখানে চাকরি করে। শাশুড়ীর সঙ্কল্প পুত্রবধূর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে সে বলে,—"তুমি একখানি পত্র পাঠাবে, আমি পাঁচখান পাঠাব।"

সত্যিই শেষে শাশুড়ী ছেলেকে একটা চিঠি লেখেন,—

"অন্নত্যাগী করেছেন বৌটি আমার।
তুমি ঘরে এলে পরে হইবে বিচার॥"

তারপর দেখা যায় বৌয়ের শাশুড়ী বিতাড়িতা। এই সময়ে বাপের বাড়ী থেকে বৌয়ের নিজের মা এলেন। মেয়ের কাছে বেয়ানের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, শাশুড়ীকে মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি কন্যার কাজকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সমর্থন করলেন। বেয়ানের দোষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,—"তা বটে মা যথার্থ বটে, সমস্ত দিন বসে থাকে আর খেতে কেমন বাপ্‌রে বাপ বেড়াল ডিঙ্গতে পারে না!" কথা প্রসঙ্গে ছেলের কাছে বেয়ানের চিঠি লেখবার কথাও প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাও জামাইকে চিঠি লিখতে বসেন কাগজ-কলম নিয়ে।—

"আমার মেয়ের সঙ্গে ঝক্‌ড়া করিয়ে।
রয়েছে তোমার মাতা অন্য বাড়ী গিয়ে॥
ত্বরায় আসিয়ে বাড়ী করিবে বিহিত॥
শাসন করিবে তারে যে হয় উচিত॥"

ওদিকে দুটি চিঠিই একই সঙ্গে ছেলের হাতে এসে পৌছোয়। পত্র-বাহক রাখালের কাছ থেকে সে জানতে পারে, চিঠি দুটির একটি তার শাশুড়ীর এবং অন্যটি তার নিজের মায়ের লেখা। রাখালকে সে বলে,—"শাশুড়ী কোনখানা লিখেছে সেইখানা দে।"—এই বলে সে শাশুড়ীর চিঠিটাই শুধু পড়ে। মার চিঠিটা সে না পড়েই ফেলে দেয়।

তারপর গিন্নীর জন্য সে কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে দেশে ফেরে। এবার গিন্নীর মানভঞ্জনের পালা। ছেলে যতোই কাতর হয়, বৌ ততোই বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখায়। শেষে বৌ শাশুড়ীর নিন্দা শুরু করে। ছেলেকে বৌ বলে, শাশুড়ী এসে কান্নাকাটি করলে ছেলের মন যেন আবার গলে না যায়! ছেলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

ইতিমধ্যে গৃহহীনা বুড়ীকে প্রতিবেশীরা জানায় যে, তাঁর ছেলে ঘরে ফিরেছে! তিনি ধীরে ধীরে মনে মনে আশীর্বাদ করতে করতে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। শাশুড়ীকে দেখেই বৌ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সে তখন তার স্বামীকে ডেকে বুড়ীকে দেখিয়ে দেয়। ছেলে তার মাকে হাত ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেয়! মর্মাহতা বৃদ্ধা পুত্রের শৈশবকালের কথাগুলো চিন্তা করতে করতে চোখের জল ফেলেন। ভাবেন, ছেলের জন্য যখন প্রাণান্ত-শ্রম করেছেন, তখন তার বৌ কোথায় ছিলো!

প্রতিবেশীরা সবাই ছেলেকে গালাগালি করে। ছেলে তখন বৌয়ের দোহাই দেয়। উপদেশ নিরর্থক ভেবে প্রতিবেশীরা ফিরে যায়। তার বুড়ীকে বলে, তারাই তাঁকে

দেখবে। অন্ততঃ দুবেলার ভাত তারাই জুটিয়ে দেবে। প্রতিবেশিনীরা বৌকে গিয়ে বোঝায়, শাশুড়ীর ভিক্ষাবৃত্তি বধূর পক্ষে সম্মানজনক নয়। বৌ বলে,—"দুধ হগ্‌গে আমার হাতে কর্ম আছে কে দেখতে যায়!" স্বামীকে সে দরজা বন্ধ করতে আদেশ দেয়।

॥ পুরু নজর—কালু মিঞা ॥

খুদাবক্স রহমনপুরে এক যুবক। তার বিধবা মা অন্যবাড়ী ধান ভেনে আর দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে মুন্‌শীর কাছে লেখাপড়া শিখিয়েছে। "আমার ঐ ছাওাল যেকন ছোট ছিল তখন তাহার বাপ মরে। রহিম মুন্‌শীর নিকট কাঁদনা করে বলিলাম ছাওালডাকে এট্টু কালির আঁচড সিকান।" আজ খুদাবক্স লায়েক হয়েছে। বিলাসিতাও শিখেছে। শহরের এক ধনীর দোকানে সে কাজ করে। তার মা গ্রামেই থাকে। এখন সে বুড়ী হয়েছে, কাজ জোটে না। যা হোক খুদাবক্সের স্ত্রী এবং সে—দুজনে মিলে খুব কষ্টে দিন কাটায়।

এদিকে খুদাবক্স আজকাল সরাব খায়, খারাপ জায়গায় যায়। তার দোস্ত গাজী তাকে এ পথে নামিয়েছে। গাজী তাকে একদিন বলে,—"তোমার বয়সকাল এখনং আমোদ করিবার সোময়। চল তোমাকে বহুত মজা দেখাইব।" এইবলে তাকে গাজী নূরবিবির মহলে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। সেখানে গাজীর সঙ্গে খুদাবক্স রোজ স্ফূর্তি করে। গ্রামের খবর নেয় না। গ্রাম থেকে তাঁর মা মিঞা ছায়েবকে তার কাছে পাঠালে সে বলে,—"তুমি চলিয়া যাও দেশের সহিত আমার কোন সমবন্ধ নাই।"

ইতিমধ্যে একদিন খুদাবক্স দোকান থেকে টাকা চুরি করে। মনিব তাকে তাড়িয়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে সে নূরবিবির কাছে গেলে নূরবিবি তাকে গলাধাক্কা দেয়। তখন ঘরের ছেলে খুদাবক্স ঘরে ফিরে চলে। গিয়ে দেখে, তার মা মারা গেছে এবং বৌ অন্য একজনকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে।

ভাষা ও অন্যান্য নমুনা :

॥ আদিরস—লেখক অজ্ঞাত ॥

(পঙ্‌ক্তি সাজানো নেই। এখানে সাজিয়ে দেওয়া হলো।)

"অর্থ আদিরস

সারদা চরণ সেবি, কবি পল্লবন রবি

মহাকবি কৃত কালীদাস।

সকল কাব্যের সার আদিরস কাব্য তার
ভাষামতে করিব প্রকাশ ॥"

কালিদাস ছাড়া অন্য কবিদের লেখা আদিরসের নমুনাও আছে। অনুবাদ বা রুচি একটি দৃষ্টান্তেই স্পষ্ট হবে।

"কথমেতৎ কুচদ্বয়ং পতিতং ভব সুন্দরী।
পথাধঃ খননমুখ পতন্তি গিরয়োপি চ ॥ ২৪ ॥
কহ না সুন্দরী হেরি একি অসম্ভব।
পতিত হয়েছে কেন কুচদ্বয় তব ॥
অহে মূঢ় কি ছার মাংসের কুচদ্বয়।
অধতে খুদিলে গর্ত গিরি নত হয় ॥"

॥ হাড় জ্বালানি—গোলাম হোসেন ॥

আরম্ভে—

"রাগিনী—নূতন বউ। তাল—ভিন্ন হাঁড়ি

বউ অভাগী ভাল থাকি ভিন্ন খাবার একখানি।
আপ্নি হয়ে বড় গিন্নি শাশুড়ী বুড়ীর হাড়-জ্বালানী।
বিয়ের পূর্বে কলির ছুঁড়ি, শিক্ষা করে ভিন্ন হাঁড়ি।
বিয়ে হলে পতি পেলে নিত্য করে কান ভাঙ্গানি।
শাশুড়ী সেবা না করিব, ভিন্ন হাঁড়ি করে খাব,
মায়ের বাড়ী গিয়া রব, সদা ভাবে বউ পাপিনী ॥"

এর মধ্যে আবার নাটকও আছে।—

"মাতা। তোর শাশুড়ী কোথা গো দেখিনি যে কোথায় গেছে বুঝি।
ঝি। না গো মা কাল সে বুড়ো বেটিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।
মাতা। বেশ করেছ২ আপদ গেছে হাড়ে বাতাস লেগেছে।
ঝি। হেঁ মা বল্তেছি, মাগি সারাদিন বসে খিট২ কত্তিইছে।
মাতা। তা বটে মা যথার্থ বটে, সমস্ত দিন বসে থাকে আর খেতে কেমন বাপরে বাপ বেড়াল ডিঙ্গতে পারে না।"

॥ কুমার কামিনী—লেখক অজ্ঞাত ॥

'নাটক' নামে অভিহিত হলেও ছোটো অক্ষরে দু-একটি কথোপকথনের সূত্রে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা পদ্যের মালা। পদ্যের বিষয়বস্তু গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনা, কিছু পৌরাণিক কথা। তবে সামাজিক বক্তব্যসংযুক্ত সংলাপও আছে।—

"কামিনী। বটঠাকুরের কি আর কর্ম হবে না।

কুমার। সাহেবদের খোসামোদ করলেই কর্ম হয়, তা উনি করবেন না, করতেও বলি না। সকল লোকে ওঁকে নিন্দে করে, 'যে মনিবে কাকে কি না বলে' 'বাঙ্গালীর অত তেজঃ ভাল নয়' কিন্তু আমি ত ও কথা গ্রাহ্য করি না। চাস করা ভাল, ত অপমান সহ্য করে চাকরি করা ভাল নয়।

কামিনী। বড়দিদীও ঐকথা বলেন। আজ বিকেলে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমার সঙ্গে কত কথাই হলো। আমি পড়তে শিখ্‌ছি বলে কত প্রেশংসাই করলেন।'

কথা বলতে বলতে বর্ণনার ব্যাপার এলেই পদ্য। যেমন,—

"কামিনী। দেখ্‌ছ, দেখ্‌তেং রাত গেল। দেখ—

রজনী রমণ শশি, গগন শোভন।
ক্রমশঃ হতেছে কত পাণ্ডুর বরণ॥"

॥ ত্রয়স্পর্শ বিবাহ—হেমন্তকুমার রায় চৌধুরী ॥

প্রথম বিরহ। ॥। দ্বিতীয় 'প্রণয়' !—

"ভুলিবার তরে বিধি. ঘটালে আবার
দিল গেঁথে গুরুজনে, দ্বিতীয় সংসার"

তৃতীয় 'প্রণয়' !—

"না হলে দ্বিতীয় বারে সন্তান সন্ততি।
দোজবরে ভেবে মরে, হবে অধোগতি॥
পুন্নাম নরক হোতে, তরিবার তরে।
তৃতীয় বারেতে পুনঃ পরিণয় করে।"

তৃতীয় 'প্রণয়ের' জ্বালা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে,—

"ওহে সর্ব দেবগণ! এ ভিক্ষা আমার!
তৃতীয় প্রণয়বিষ দিও না কো আর!!
এ বিষ ঢেলেছে বিধি, যাহার কপালে।
সেই জানে কত জ্বালা, শয়নের কালে॥
মনে ভালবাসা নাই, অন্য আশে মন!
বুড়োকে ঠকায় ছুঁড়ী, ঘুরায়ে বদন॥
পাশের বালীশ বুড়ো. কখনো যুবতী।
ভেকেরে ভুলায় যেন কমলিনী সতী!!

বুড়োরে পাড়ায়ে ঘুম, ফাঁকি দিয়ে তাকে।
তার কাছে ছুটে যায়, ভালবাসে যাকে ॥
তাই বলি, দেবগণ! মিনতি আমার
তৃতীয় প্রণয় বিষ দিও না কো আর ॥"

॥ সোহাগ—গোঁসাই চাঁদ সরকার ॥

প্রিয়তমার প্রতি কবির লিরিক উচ্ছ্বাসের নমুনা—

"কে তুমি রে পাগলিনি, মম হৃদি বিলাসিনি!
নয়নের পথে, প্রিয়ে, খেলিয়ে বেড়াও রে?
কে তুমি রে মনোরমে বল বল, প্রিয়তমে।
সুধামাখা হাসিমুখ আমারে দেখাও রে?
কিরূপ স্বরূপ তব, প্রিয় রে কেমনে কব?
কিসের তুলনা দিব ভাবিয়ে না পাই রে;
কোথাও নাহিক যাহা তোমাতে আছয়ে তাহা,
সংসারের সার তুমি জানিয়াছি তাই রে।"

॥ কি মজার শনিবার—চন্দ্রকান্ত শিকদার ॥

একটি গানের নমুনা—

"রাগিনী ক্রোরগ্যাক। তাল ডঙ্ক ফোঁস।

ধন্য কল্‌কেতায় সহার ধন্য শনিবার।
বোতল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে ক্যা বাহার ॥
সোনাগাজি উড়ছে ধ্বজা, বড ধূম পুড়ছে গাঁজা,
মদ খেয়ে করছে মজা, মেছুয়া বাজার ॥
হাড়কাটা হেসে খেলে, গ্ল্যাস ধরে মুখে ঢেলে,
অবশেষে বলছে বুলি, ক্যায়ছা মজেদার ॥"—ইত্যাদি।

প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকটি পথ-সাহিত্য নির্বাচন করে যে-সব দিক থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো, তা নয়। হাতের কাছে কিছু উপাদান ছিলো, সেগুলির থেকেই কয়েকটি এখানে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য অনেক আকর্ষণীয় ও বিচিত্র উপাদান বাইরে থেকেই আছে। উনিশ শতাব্দীর পথ-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ যাতে পাঠক লাভ করেন, সেই উদ্দেশ্যেই এগুলি দিলাম।

ঘটনা-কেন্দ্রিক পথ-পুস্তিকা রচনা : একটি দৃষ্টান্ত

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাছ সংক্রান্ত কিছু পথ-পুস্তিকা রচনার দৃষ্টান্ত আছে। পথ-পুস্তিকা রচনার সংখ্যা দ্বারা সমকালীন উত্তেজনার গুরুত্ব জানা যায়। এই সংখ্যার সঙ্গে লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সেই গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। বইয়ের জনপ্রিয়তা বা কাটতি সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হলেও সেখানেও উত্তেজনার বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না।

বাঙালী মৎস্য ভোজী। মাংসাহার বিশ শতাব্দীর মতো উনিশ শতাব্দীতে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যাপক ছিলো না। মাংসাহারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল বক্তব্যও সেই সময়কার পত্র-পত্রিকায় ইতস্ততঃ প্রকাশিত হয়েছে। (যেমন,—'সাধারণী' পত্রিকা ৫ই মাঘ, ১২৮১ সাল)। এই সময় বলা বাহুল্য মাছের প্রতি আসক্তি যথেষ্টই ছিলো। আমিষ ভোজনে যাঁদের তৃপ্তি, অথচ লোকভয়ে মাংস খেতে পারেন না, তাঁরা মাছ ছাড়া খেতেই পারতেন না। উনিশ শতাব্দীর পত্রিকায় মৎস্যাহারের প্রশস্তিও কম ছিলো না। পূর্বোক্ত 'সাধারণী' পত্রিকায় ১২৮০ সালে জহরলাল বিশ্বাস তাঁর 'মৎস্যকৃষি' প্রবন্ধে লেখেন,—"উৎসবাদি বা অন্য কোন সমারোহ ব্যাপারে মৎস্যব্যঞ্জনাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা আমাদের একটি প্রাত্যহিক খাদ্য বলিয়া পরিগণিত।...মৎস্যে সাধারণতঃ শতকরা ১৪ ভাগ যবক্ষারজান, ৭ ভাগ অঙ্গার, ১ ভাগ ধাতব দ্রব্য ও ৭৮ ভাগ জল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ আছে। মৎস্য ব্যবহারে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি, মানসিক বৃত্তিসমূহ তীক্ষ্ণ ও মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এ কারণ চিকিৎসকগণ রোগান্তে দৌর্বল্য নিবারণের জন্য মৎস্য ঝোলের পথ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"

মৎস্যপ্রিয় বাঙালী হুজুগপ্রিয়ও বটে। এই হুজুগ সম্পর্কে ১২৮২ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় বলা হয়েছে,—"পূর্বে শুনিয়াছিলাম, হুজ্জতে বাঙ্গালা, হুজুরে চীন ; এখন দেখিতেছি, কেবল হুজ্জতে বাঙ্গালা নয়, হুজুকেও বাঙ্গালা। এত হুজ্জতও আর কোথাও নাই, এবং এমন হুজুকে দেশও অতি অল্প আছে।" একই পত্রিকায় এইসব হুজুগের ব্যাপারে অন্যত্র (১২৮০ সাল, ৬ই মাঘ) মন্তব্য করা হয়েছে,—এ সব হুলুস্থুলের "তার কিছু ফল থাকুক বা না থাকুক, বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি কথঞ্চিৎ খেলা করিতে পায় এবং তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবেক।"

মাছ সংক্রান্ত একটি বিষয়ে যে বেশ কিছু পথ-পুস্তিকা রচনা হয়েছিলো, তার মূলে ছিলো গুজব। সেকালের সংবাদপত্রগুলো পড়লে মনে হয়, গুজব আর সংবাদের মধ্যে

বিশেষ পার্থক্য ছিলো না। তবুও তার মধ্যে একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১২৮২ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাধারণী পত্রিকায় একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।— "পদ্মার মৎস্যে একপ্রকার পোকা জন্মিয়াছে। এই মৎস্য ভক্ষণ করাতে লোকের পীড়া জন্মিতেছে। ইলিশ মাছেও কি পোকা হইয়াছে?" ঐ সপ্তাহের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় এ-বিষয়ে আর একটু বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়।—

"ঢাকা প্রদেশে মাছের মধ্যে অত্যন্ত মহামারি উপস্থিত হইয়াছে; এমনকি তথাকার বাজারে মাছ পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। তথাকার ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সমুদায় মাছের ভিতর একপ্রকার ছোট ছোট পোকা হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহাদের একপ্রকার বসন্ত রোগ হইয়াছে, সেই রোগের জন্য ইহাদের গায়ে পোকা জন্মিয়াছে; এ মাছ খাইয়া যাহাদের পীড়া হইবে তাহাদের আর নিস্তার নাই। জেলেরা মাছের কল্যাণে স্বস্ত্যয়ন ও পূজা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ ঐ দেশে মাছ একটি প্রধান খাদ্য, তজ্জন্য লোকের আহার বিষয়ে বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছে। নিরামিষভোজী লোকের আর এরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না।"

এই ঘটনা এ সময় মৎস্যভোজী বাঙালীদের কারো মনে এনেছিলো ভীতি, আবার সত্যতা সম্পর্কে সংশয়। একদল হুজুগপ্রিয় বাঙালী এর ভয়াবহতা সবিস্তারে প্রচার করেছেন; আবার কেউ কেউ এটাকে একটা অজ্ঞাত উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলেও মনে করেছেন। ধর্মধ্বজ সম্প্রদায় একে ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শুধু মৌখিক প্রচারে নয়, পথ-পুস্তিকার মধ্য দিয়েও প্রচারে তাঁরা যে যত্ন নিয়েছেন, তার প্রমাণ এ-বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা কিছু পথ-সাহিত্য।

মাছ-সংক্রান্ত হুজুগ শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। পূর্বোক্ত 'সাধারণী' পত্রিকার ১২৮২ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখের সংখ্যার সংবাদে আছে,— "বর্ধমানে মাছে পোকা হইয়াছে, বলিয়া একটি মহৎ জনরব উঠিয়াছে, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। এখানকার অধিকাংশ লোকই প্রায় মৎস্যাহার ত্যাগ করিয়াছেন।"

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি পথ-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। Descriptive Catalogue থেকে এগুলির সম্পর্কে সামান্য কিছু জানতে পারি। এই বইগুলির কোনোটিই এখন পাওয়া যাচ্ছে না।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পথ-পুস্তিকাগুলি সম্পর্কে পরিচয় দিই।

১. **জেলে মেছনীর খেদ**—জহরীলাল শীল॥ অন্যত্র 'জহরলাল' এই নামও পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্পর্কে সরকারী নথিতে

লেখা আছে,—"**The lament of Fish Sellers, in consequence of fish being supposed to be infested by worms and unsaleable.**"

২. **মাছের বসন্ত**—দ্বিজরাজ শর্মা ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার বই। এই বইটি সম্পর্কে নথির মন্তব্য,—"**A poem. rediculing the idea of fishes being diseased.**

৩. **মাছ খাব কি পোকা খাব**—চিন্তামণি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১০ পৃষ্ঠার বইটি সম্পর্কে সরকারী নথিতে এইটুকু মন্তব্য আছে,—"**A poem on the alleged disease among fish**".

৪. **মাছের পোকা**—জহরীলাল শীল ॥ অন্যত্র 'জহরলাল' এই নামও পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্পর্কে সরকারী নথির মন্তব্য,—"Verses rediculing the popular belief of the presence of worms in fish, rendering them unfit for food."

৫. **মেছেনীর দর্পচূর্ণ**—আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্পর্কে সরকারী নথির বক্তব্য,—"A poem on the subject of fish being unfit for food."

৬. **মাছে পোকা**—বাদলবিহারী চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার বইটি একই বিষয় নিয়ে লেখা। তবে এই বইটি নাটারীতিতে লেখা, এটুকু জানা যায়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেও একই ধরনের বিষয়ে কিছু পদ্য-পুস্তিকা রচিত হয়েছে। আগের বছরে যে লেখক দুজন মোটামুটিভাবে তাঁদের বই লিখে খ্যাতি পেয়েছিলেন, তাঁরাই আবার পুরোনো উত্তেজনাকে জাইয়ে একই ধরনের বিষয়ে নতুন বই লেখার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য তেমন সফল হয় নি। বই দুটি যথাক্রমে—

৭. **নূতন পোকা**—জহরীলাল শীল ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার এই বইটির সম্পর্কে সরকারী মন্তব্য পড়লে মনে হয়, এটির মধ্যে মেছো-ব্যাপার নাও থাকতে পারে।—"A Poem on the disease called 'Kutmaria' said to be generated by a worm.

৮. **নূতন রোগ**—আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার এই বইটি পূর্ববর্তী বিষয় নিয়ে লেখা। সরকারী মন্তব্য,—"**New disease called 'Kutmaria'.**"—'Kutmaria' রোগটি কী এবং মাছের রোগ কি মানুষের রোগ, সে-বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থকার সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই আলোচনায় বিশল্যকরণীর সঙ্গে গন্ধমাদনের কিছু পাথর থেকে গেলো।

সেকালে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বহু হৈ-চৈ হয়েছে ; তার সঙ্গে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য পথ-পুস্তিকা। আশ্বিনে ঝড়, কার্তিকে ঝড়, বেশ্যা আইন, ডেঙ্গুজ্বর, মোহন্ত মামলা, নাপিতের মামলা, ড্রেনের হুজুগ, পোলের হুজুগ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সোনা গাজীর খুন, কালীঘাটের গয়না চুরি, আনন্দময়ীর পাঁঠাচুরি, জগন্নাথের মন্দির ভেঙে পড়া, যুবরাজের আগমন, পুলিশ ঘাটে বিস্ফোরণ, মামা-ভাগ্নীর কেচ্ছা, ঘিয়ে ভেজাল, সাহেবের বেলুন চড়া—এসব হুজুগের তালিকা বলে শেষ করা যাবে না। মাছের হুজুগ সেই জাতীয় একটা হুজুগ। হুজুগ যেমন জোয়ারের মতো আসে, আবার জোয়ারের মতো নেমে যায়, তেমনি মাছের হুজুগও পরে আর থাকে নি।

উপসংহার

পথ-সাহিত্য ও পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাধারণভাবে ভূমিকা হিসেবেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হলো। পথ-সাহিত্য ঠিক কাকে বলে, এ নিয়ে মতবিরোধ থাকবে। কিন্তু গ্রন্থকারের আশা, এর মধ্য দিয়ে পথ-সাহিত্যের একটা খাঁটি সংজ্ঞা গড়ে উঠবে। পথ-সাহিত্যের সংজ্ঞা গড়ে উঠলেই পথ-পুস্তিকার সংজ্ঞাও গড়ে উঠবে। পথের জিনিসের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার তেমন আবিষ্টতা থাকে না, গভীরতা থাকে না। এর ভাষা ও ভাব সহজ, রসের চেয়ে উত্তেজনা বড়ো। সুতরাং পথের মানসিকতা দিয়েই পথ-সাহিত্যের মানসিকতা উপলব্ধি করতে হবে।

বিশেষ করে পথ-পুস্তিকার ভাষা রীতি উপস্থাপন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কিত রুচিগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। পথ-পুস্তিকায় স্থূলতা থাকলেই বা জঘন্য-রুচির কাহিনী থাকলেই তা খারাপ উদ্দেশ্যেই যে সর্বদা রচিত হবে, এ ধারণা রাখাও অন্যায়। ধরুন একটি কাহিনী (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ১৬২-সংখ্যক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)। একজন অর্থপিশাচ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে অর্থলাভের জন্য মেয়ের আর একবার বিবাহ দিলেন। জামাই ফিরে এসে বৌকে না পেয়ে এবং সব জানতে পেরে শাশুড়ীকে নিয়ে ভেগে পড়লো। শাশুড়ী-জামাইয়ের যৌন সম্পর্ক অরুচিকর। কিন্তু অর্থপিশাচ প্রতারক—তা সে ব্রাহ্মণই হোক বা যেই হোক, তার শাস্তি কামনা করছে এইসব অর্ধশিক্ষিত সাধারণ সমাজ, এটা পরিষ্কার। এই জাতীয় অর্থলোভও প্রতারণা এবং সমাজের পক্ষে তা অহিত; তারই প্রতি এরা বিরূপতা প্রকাশ করেছে। এই বিরূপতাকে প্রশংসা করবেন যে কোনো সমাজ হিতৈষীই। শুধু একটি দুর্নীতিকে অন্য দুর্নীতি দিয়ে শায়েস্তা করা হয়েছে। এতে এই মত পরিষ্কার যে, যৌন 'দুর্নীতির' (নিষিদ্ধ সম্পর্কজনিত) চেয়েও প্রতারণা আরো জঘন্য অপরাধ। 'বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী' (১৬৩-সংখ্যক পুস্তিকা) যদি অন্যের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তার সমর্থনেও সেই একই বক্তব্য। তরুণীকে বৃদ্ধের বিবাহ করা অর্থ যৌন দিক থেকে তাকে প্রতারণা করা। অতএব শঠে শাঠ্যং আচরণ বিধেয় এদের মতে। সুতরাং এদের দৃষ্টিভঙ্গীকে একটু উদারভাবে দেখা উচিত।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস শুধু সাহিত্যের Quality নিয়েই চর্চা করে, গভীরতা নিয়েই চর্চা করে। Quantity বা ব্যাপ্তির কথা ভাবে না। রক্ষণশীল ঐতিহাসিকের মতো সাহিত্যের রাজারাজড়া নিয়েই সমালোচক বা ঐতিহাসিকদের কারবার। অভিজাত সাহিত্যিকদের মতোই পথ-পুস্তিকার লেখকরা তো লেখনী ধরেছিলেন সমাজের আর পাঁচজন মানুষের জন্য। তাঁদের সৃষ্টি কি ব্যর্থ?

প রি শি ষ্ট

ক. আনুষঙ্গিক গ্রন্থ তালিকা (১৯শ শতক)

পরিশিষ্ট অংশে আমার কাগজপত্রে রক্ষিত কিছু অতি ক্ষীণায়তন পুস্তিকার তালিকা দিলাম। এগুলি উনিশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এগুলি হয়তো পথ-সাহিত্য নয়। কিন্তু ক্ষীণায়তন পুস্তিকার নাম কালক্রমে বিস্মৃত হবো আমরা। তাছাড়া পথ-সাহিত্য সম্পর্কে পরবর্তী কালে পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হলে, পথ-সাহিত্য হিসেবে প্রদত্ত তালিকা থেকে কিছু বই বাদ যাওয়া যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি এই তালিকা থেকে দুই একটি বইয়ের পথ-সাহিত্যের মধ্যে চলে যাওয়াও সম্ভব।

॥ পথ-সাহিত্যের আওতা থেকে আপাততঃ বহির্ভূত অতিক্ষীণায়তন কিছু গ্রন্থের তালিকা ॥

১. পদ্যমঞ্জরী (৪র্থ সং)—প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ ঢাকা—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১২
২. স্বস্থলে পায় বসতি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-৪
৩. অপব্যয়ী পুত্র—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১০
৪. মধুবিলাপ—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১২
৫. অবাধ্য বালক—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১৮
৬. খনার বচন—কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় ॥ গোলচিপা—১৮০৫। পৃষ্ঠা-১২
৭. সুকুমার বিলাস—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৫২। পৃষ্ঠা-১৭
৮. জ্ঞানকর—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৪৮। পৃষ্ঠা-১৫
৯. সংসার সার—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৫২ (১ম সং—১৮২৯)। পৃষ্ঠা-১২
১০. জ্ঞানোপদেশ—আই. সি চট্টোপাধ্যায় ॥ ?—১৮৫৩। পৃষ্ঠা-১৪
১১. স্বপ্নাধ্যায়—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮২০। পৃষ্ঠা-১৬
১২. পরিশ্রম প্রয়োগ—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ?—১৮৫৩। পৃষ্ঠা-৮
১৩. (Discourse on Justice and Mercy)—লেখক অজ্ঞাত। জাগুলিয়া—১৮৫৩। পৃষ্ঠা-১৬
*১৪. কালীঘাট মন্দির—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১১
*১৫. মুছে রায় বার—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৫
*১৬. দেববংশ বর্ণন—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-৮

*১৭. শিবরাম যুদ্ধ—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—? । পৃষ্ঠা-১১

১৮. মণিহরণ—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৩৮ । পৃষ্ঠা-১৭

১৯. প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥ ?—১৮৫২ । পৃষ্ঠা-১৪

২০. অপরাধ ভঞ্জন—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৫২ । পৃষ্ঠা-১২

২১. অবতরণিকা—রামমোহন রায় ॥ ?—১৮২৯ । পৃষ্ঠা-১২

২২. গুরু পাদুকা—রামমোহন রায় ॥ ?—১৮২৩ । পৃষ্ঠা-৬

২৩. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রার্থনা—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ॥ ?—১৮২৩ । পৃষ্ঠা-৪

*২৪. দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর—মনীন্দ্রমোহন চন্দ ॥ ?—?—?

*২৫. পাগলের পাগলামি—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?—?

*২৬. জাতিভেদ—কেদারনাথ সরকার ॥ ?—?—?

২৭. সঙ্গীত প্রবন্ধ—ব্রজলাল সাহা ॥ ?—১২৭৮ সাল । পৃষ্ঠা-১৬

২৮. সায়ং চিন্তা—সবোজকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ ?—১৮৮২ । পৃষ্ঠা-১৩

২৯. ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ—লেখক অজ্ঞাত ॥ ১৭৮৫ শক । পৃষ্ঠা-৯

৩০. কায়স্থ কৌস্তুভ—রাজনারায়ণ মিত্র ॥ ?—১২৫১ সাল । পৃষ্ঠা-১৫

৩১. হিন্দু পেট্রিয়ট…ইত্যাদি—কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ ?—? । পৃষ্ঠা-১৬

৩২. তালাকের উপর মায়ল হওয়া বিহিত কিনা—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৬২ । পৃষ্ঠা-১৭

৩৩. রাস রস কণিকা—কমলাকান্ত দত্ত ॥ ?—১৩০২ সাল । পৃষ্ঠা-১৮

৩৪. যমুনালহরী—গোবিন্দচন্দ্র রায় ॥ ?—? । পৃষ্ঠা-১২

৩৫. আকৃতি তত্ত্ব—বলাইচাঁদ সেন ॥ ?—১২৭৮ সাল । পৃষ্ঠা-১৬

৩৬. বর্ণমালা—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৭৬৬ শক । পৃষ্ঠা-১৩

৩৭. কংগ্রেস—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৯৭ । পৃষ্ঠা-১২

৩৮. কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৯৭ । পৃষ্ঠা-১২

৩৯. গীতাঙ্কুর—টেকচাঁদ ঠাকুর ॥ ১২৬৮ সাল । পৃষ্ঠা-১৬

৪০. আধ আধ ভাষিণী—প্রসন্নময়ী দেবী ॥ কলকাতা—১৮৭০ । পৃষ্ঠা-১২

+৪১. আগমনী পাঁচালী—দ্বারিকানাথ দত্ত ॥ ?—১৮৭২ । পৃষ্ঠা-১২

+৪২. আক্ষেপনামা —আহম্মদ গাজী চৌধুরী ॥ বরিশাল—১৮৭৬ । পৃষ্ঠা-৮

৪৩. আনন্দলহরী—দুর্গাচরণ মজুমদার ॥ বগুড়া—১৮৯২ । পৃষ্ঠা-১৬

৪৪. বৃহৎ আশ্রয় নির্ণয়—কৃষ্ণদাস গোস্বামী ॥ ঢাকা—১৮৯৪ । পৃষ্ঠা-১২

৪৫. গীতধারা—বিপিনবিহারী শল ॥ ?—১৮৭৪ । পৃষ্ঠা-১৬

৪৬. গীত মাধুরী—গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ॥ কলিকাতা—১৮৭৬ । পৃষ্ঠা-১২

৪৭. গীতাঙ্কুর—কৈলাসচন্দ্র দে ॥ ঢাকা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬
৪৮. গ্রহদোষঘ্ন—লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১২
৪৯. জগদ্বল্লভ পুরস্ত বিজ্ঞাপন—বিহারীলাল শাহ্ ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১১
৫০. জ্ঞানমঞ্জরী—হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১২
৫১. কবিতা কলাপ—গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৬
৫২. কবিতাষ্টক—প্রশন্নকুমার চক্রবর্তী ॥ ঢাকা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-৮
৫৩. কাব্যকুসুম—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২
৫৪. খনার বচন—লেখক অজ্ঞাত ॥ গোলচিপা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১২
+৫৫. কুসুম বিকাশ—গঙ্গাচন্দ্র ধর ॥ মৈমনসিংহ—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১২
৫৬. লঘুভক্তি রত্নাবলী—জীব গোস্বামী ॥ কলকাতা—১৮৮২। পৃষ্ঠা-১৪
৫৭. মহেশ মাহাত্ম্য—গোঁসাইদাস সরকার ॥ কলকাতা—১৮৯২। পৃষ্ঠা-১০
*৫৮. মনোরমা—জনৈক হিন্দু মহিলা ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৮
৫৯. মাতৃ-বিলাপ—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ মেদিনীপুর—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১২
৬০. মাতৃ-বিয়োগ বিলাপ—গোপালচন্দ্র সরকার ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬
+৬১. পদ্য চতুষ্টয়—জনৈক হিন্দু মহিলা ॥ কলকাতা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১২
৬২. পদ্যাঙ্কুর—দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ॥ কলকাতা—১৮৬৪। পৃষ্ঠা-১৩
৬৩. পদ্য পরিচয়—অক্ষয়কুমার সেন ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১২
৬৪. পদ্যসার—ব্রাহ্মচরণ চক্রবর্তী ॥ ঢাকা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৪
৬৫. পদ্যাবলী—সুরেশচন্দ্র মিত্র ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৪
৬৬. পরমার্থ পদাবলী—দ্বারকানাথ রায় ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৬
+৬৭. পরমার্থ সঙ্গীত—রামকুমার রায় ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-৮
৬৮. ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১১
৬৯. প্রতি উপহার—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬
৭০. ঋতু মালা—কানাইলাল মিত্র ॥ কলকাতা—১৮৬৮ ? পৃষ্ঠা-১২
৭১. রূপ চিন্তামণি—ভজনানন্দ দাস ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-৯
৭২. সঙ্গীত সংগ্রহ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১২
৭৩. শনিপূজার পুস্তক (২য় সং)—রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢাকা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১২
+৭৪. সন্ন্যাসিনীর উপাখ্যান—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৪

৭৫. সরল কবিতা—গগনচন্দ্র সেন ॥ ঢাকা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৫
৭৬. সরল কবিতা—প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ॥ ভবানীপুর—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-৭
৭৭. শরৎসুন্দরী চরিত্র—গোঁসাইদাস সরকার ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-৮
৭৮. সত্যনারায়ণ—রামেশ্বর ঠাকুর ॥ কলকাতা—১৮৬৯। পৃষ্ঠা-১৬
৭৯. সত্যনারায়ণ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৬
৮০. সত্যনারায়ণ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬
৮১. সত্যনারায়ণের কথা—বঙ্কিমবিহারী মজুমদার ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬
৮২. সত্যনারায়ণের পাঁচালী (২য় সং)—লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৩
৮৩. শিশু মোদন—রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ গৌহাটী—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৫
৮৪. শিশু রঞ্জন—প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢাকা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১২
৮৫. শ্লোক লহরী—বঙ্কবিহারী শর্মা ॥ শ্রীহট্ট—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১২
৮৬. সুবচনী ব্রতকথা—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১২
+৮৭. স্বর্গ ও পরী—লেখক অজ্ঞাত ॥ পাটনা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১১
৮৮. স্বর্ণলতা—বিশ্বেশ্বর দেব ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১১
৮৯. তত্ত্বমঞ্জরী—হরিচন্দ্র চৌধুরী ॥ ঢাকা—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১৬
৯০. ত্রিনাথের পাঁচালী—গোপালচন্দ্র মান্না ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১২
৯১. ত্রিনাথের পাঁচালী—লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১২
৯২. ত্রিনাথের পাঁচালী—আনন্দচন্দ্র রায় ॥ ঢাকা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১২
৯৩. ত্র্যাহিক জ্বরের পুথি—আবদুল রহিম ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১২
৯৪. বিলাপলহরী—বলাইচাঁদ সেন ॥ কলকাতা—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১৩
৯৫. বিলাপতরঙ্গ—মহিমচন্দ্র বসু ॥ ঢাকা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৩
৯৬. বিলাপী বিলাপ—কুঞ্জবিহারী হালদার ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-৯
৯৭. বিয়োগী বন্ধু—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১২
৯৮. যমকালী গ্রন্থ—নিত্যানন্দ দাস ॥ ঢাকা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬
৯৯. যোগাধ্যার বন্দনা—কৃত্তিবাস ॥ কলকাতা—১৮৫৬। পৃষ্ঠা-৮
১০০. ইরিগেসান সম্বন্ধীয় নিয়ম—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৮০ ? পৃষ্ঠা-১৬
১০১. রহস্য প্রচার—মদনমোহন বসাক ॥ কলকাতা—১৮৬৯। পৃষ্ঠা-১৪
১০২. দেহরক্ষা—লেখক অজ্ঞাত ॥ শ্রীরামপুর—১৮৫৫। পৃষ্ঠা-১৬
১০৩. দেহরক্ষা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭০ ? পৃষ্ঠা-১৬
১০৪. উপদেশ শতক—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢাকা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৬
+১০৫. হেঁয়ালী (২য় সং)—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১০

১০৬. পথকর দর্শন—লেখক অজ্ঞাত ॥ বর্ধমান—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৪
১০৭. (Formulary Book)—লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১২
১০৮. গর্মী ও প্রমেহ রোগের চিকিৎসা—মাধবচন্দ্র সাহা ॥ ঢাকা—১৮৭৬ পৃষ্ঠা-১২
১০৯. গোমস্থর্ধাধান বিষয়িনী পুস্তিকা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৩। পৃষ্ঠা-১৩
১১০. বিবিধ মহৌষধ—করালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১৪
১১১. নেশানাশক সভা—টমাস ইভান্স ও জে. এইচ. বাউস ॥ কলকাতা—১৮৭৬ পৃষ্ঠা-৪
১১২. ধীরাজ চরিত্র—শ্যামানাথ চৌধুরী ॥ শ্রীরামপুর—১৮৫৪। পৃষ্ঠা-১২
১১৩. জীবনচরিত—নৃত্যগোপাল ঘোষ ॥ মুর্শিদাবাদ—১৮৭২। পৃষ্ঠা-৮
১১৪. কৃত্তিবাস পরিচয়—হরিশ্চন্দ্র মিত্র ॥ ঢাকা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-৮
১১৫. বংশাবলী—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৫৫। পৃষ্ঠা-১৫
১১৬. স্বর্ণ বণিক—বলাইচাঁদ সেন ॥ কলকাতা—১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৩
১১৭. দিল্লীর রাজাদির নাম—আলিম-আল্-দীন ॥ বরিশাল—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১১
১১৮. ইতিহাসের নূতন উপাদান—হরচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৫
১১৯. কায়স্থ নৃপ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২ ॥ পৃষ্ঠা-১০
১২০. ময়ূর তথ্ত্—রামনারায়ণ দাস ॥ বাঁকুড়া—১৮৯৪। পৃষ্ঠা-১৬
১২১. কুমুদিনী—কুঞ্জবিহারী বসু ॥ কলকাতা—১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২
১২২. মনোরম পাঠ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১১
১২৩. নীতিকদম্ব—অতুলচন্দ্র দাস ॥ ঢাকা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬
১২৪. আবু সামার পুথি—জৈমুল আবেদীন ॥ ?—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১৬
১২৫. আবু সামার পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬
১২৬. আবুসামার পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৯। পৃষ্ঠা-১৬
১২৭. আবু সামার পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬
১২৮. আবু সামার পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৬
১২৯. আবু সামার পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা ১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬
১৩০. আহমক নামার পুথি—কামার আল্দীন ॥ কলকাতা—১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১৬
১৩১. আনন্দোপদেশ—গোপাললাল বসু ॥ কলকাতা—১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২
১৩২. চন্দ্রাধরা তরঙ্গিনী—প্যারীলাল চক্রবর্তী ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১১
১৩৩. ইমাম চুরির পুথি—ফকির আল্দীন ॥ কলকাতা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬
১৩৪. ইমাম চুরির পুথি—ঐ ॥ কলকাতা—১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১৬

১৩৫. ইমাম চুরির পুথি—ফকির আল্‌দীন ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৬
১৩৬ ইমাম চুরির পুথি—ঐ ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬
১৩৭. ইমাম চুরির পুথি—ঐ ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১৬
১৩৮. লালমোনের পুথি—শেখ আরিফ ॥ কলকাতা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬
১৩৯. লালমোনের পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৬
১৪০. লালমোনের পুথি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১৬
১৪১. হিত প্রার্থনা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১১
১৪২. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৯। পৃষ্ঠা-৯
১৪৩. উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬০। পৃষ্ঠা-১৬
১৪৪. বক্তৃতা—হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-৮
১৪৫. ব্রাহ্ম উপাসনা পদ্ধতি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৫
১৪৬. নরপূজা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৯। পৃষ্ঠা-১২
১৪৭. মুঙ্গেরে ব্রাহ্মসমাজ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬
১৪৮. ঈশ্বর প্রদত্ত রত্নমালা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৯। পৃষ্ঠা-১১
১৪৯. স্নানকোষ—ক্রিষ্টোফার কুমার ॥ ভবানীপুর—১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২
১৫০. সূর্যালোক—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা ১৪
১৫১. দুর্গাদেবীর বৃত্তান্ত—লেখক অজ্ঞাত ॥ মেদিনীপুর—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১৬
১৫২. জগন্নাথ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১১
১৫৩. পরলোক—ঈশানচন্দ্র দে ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১২
১৫৪. সর্বসাধারণ পত্র—আর. জে. এলিস ॥ কলকাতা—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১৪
১৫৫. বাঙ্গালা পারমার্থিক সঙ্কীর্তন—আর. এ. শাহ্ ॥ ভবানীপুর—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৭
১৫৬. ছাত্রভুক্তকরণের চিঠি—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৩
১৫৭. দৈবভজনার অঙ্কুর—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৭। পৃষ্ঠা-১৬
১৫৮. গীতরত্ন—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৭
১৫৯. গীতরত্ন—লেখক অজ্ঞাত ॥ মেদিনীপুর—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬
১৬০. ঐশ্বরিক বিচার—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-৬
+১৬১. অকস্মাৎ বজ্রাঘাত—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-৬
+১৬২. আসিয়া দেখ—লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১৬
১৬৩. বালীর বাঁধ—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-৬
১৬৪. বালুকায় চিহ্ন—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬

১৬৫. ভগ্ন সেতু—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬

১৬৬. ভয়ানক গ্রাম—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬

১৬৭. দুই মেষ শাবক—মিস্ নিলি ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬

১৬৮. গচ্ছিত ধন—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৮

১৬৯. গল্পরত্ন—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৮

১৭০. গোলাপী চাদরের গল্প—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৭

১৭১. ঈশ্বর মানুষ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৫

১৭২. ঈশ্বরের অস্তিত্ব—লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১৪

১৭৩. জগত্তারকা—মিসেস কে. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১২

১৭৪. কালের হাটে যেতে হবে—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-৬

১৭৫. কঠিন পর্দা—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬

১৭৬. কুক্কুটীর বাৎসল্য—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬

১৭৭. ললিতাকাহিনী—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭১। পৃষ্ঠা-৫

১৭৮. মহানন্দের সুসমাচার—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১২

১৭৯. মরীচিকা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-৬

১৮০. নিকাশ দিতে হবে—লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১৮

১৮১. নূতন জন্ম—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১২

১৮২. নূতন রকমে কলা খাওয়া—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬

১৮৩. পাকা আম—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৪

১৮৪. ফাটা শিশি—A. L. O. E ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬

১৮৫. ফোয়ারা ও মেঘ—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬

১৮৬. পিতৃবৎসল পুত্র—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬

১৮৭. পিত্তলের সাঁপের বয়ান—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১২

১৮৮. প্রাচীন কাহিনী (৩য় সং)—লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১৫

১৮৯. প্রজ্বলিত গৃহ—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬

১৯০. প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান ও প্রচার—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১১

১৯১. প্রেমোপাখ্যান—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৪

+১৯২. রাজভবনে নিমন্ত্রণ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১২

১৯৩. রাখাল মোহিনী—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৮

১৯৪. ঋণ পরিশোধ—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা ১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৪

১৯৫. সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা—লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর—১৮৭১। পৃষ্ঠা-১৪

১৯৬. সত্যতীর্থযাত্রা (৩য় সং)—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৬৯ । পৃষ্ঠা-৮

১৯৭. স্বপ্নকথা—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭ । পৃষ্ঠা-১৬

১৯৮. স্বর্গে ধন সঞ্চয়—এস্. সি. ঘোষ ॥ কলকাতা—১৮৭৪ । পৃষ্ঠা-১৮

১৯৯. ঠিকুজী—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৬ । পৃষ্ঠা-১৬

২০০. তিনটি বিপদ—A. L. O. E. ॥ কলকাতা—১৮৭৭ । পৃষ্ঠা-১৬

২০১. বিশ্বাস কাহাকে বলে—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭২ । পৃষ্ঠা-১৬

২০২. যীশুর কাছে আইস—লেখক অজ্ঞাত ॥ মেদিনীপুর—১৮৬৭ । পৃষ্ঠা-১০

২০৩. ভাগবত নির্ণয়—গঙ্গাধর কবিরাজ ॥ কলকাতা—১৮৫৭ । পৃষ্ঠা-১৫

+২০৪. দুর্গোৎসব—রামচন্দ্র পাঠক ॥ কলকাতা—১৮৭৪ ॥ পৃষ্ঠা-৬

২০৫. একাদশীর ব্যবস্থা—ঈশানচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ রামপুর বিউলিয়া—১৮৬৮ । পৃষ্ঠা-৮

২০৬. ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী—গুরুপ্রসাদ ভৌমিক ॥ ঢাকা—১৮৮৪ । পৃষ্ঠা-১৬

২০৭. জ্ঞানাঙ্কুর—ঈশ্বরচন্দ্র দে ॥ ঢাকা—১৮৯৫ । পৃষ্ঠা-৯

২০৮. সমুদ্রযাত্রা বিচার—কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা—১৮৯৮ । পৃষ্ঠা-৭

২০৯. বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকা—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৩৩ । পৃষ্ঠা-১০

২১০. বাহ্‌র অল্-অসরার—লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা—১৮৭৮ । পৃষ্ঠা-১৬

২১১. গঞ্জ অল্ আরজ—হাফিজ আল্লাহ্ ॥ ঢাকা—১৮৭৪ । পৃষ্ঠা-৮

২১২. হুজ্জৎ ই সালিহিন—মনীর অল্ দীন ॥ বরিশাল—১৮৭৬ । পৃষ্ঠা-১২

২১৩. মুহফিল নামাহ্—উমর শাহ্ ও আব্দুল করীম ॥ বরিশাল—১৮৭৫ । পৃষ্ঠা-১১

*২১৪. কৌলীন্য সংশোধনী—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—? । পৃষ্ঠা-১৩

২১৫. সঙ্গীত প্রবন্ধ—ব্রজলাল সাহা ॥ ?—১২৭৮ সাল । পৃষ্ঠা-১৬

*২১৬. গীতিকবিতা (১ম)—গোবিন্দচন্দ্র রায় ॥ ?— ? । পৃষ্ঠা-১২

*২১৭. শিশু সেবধি (১ম)—ক্ষেত্রমোহন দত্ত ॥ ?— ? । পৃষ্ঠা-১৪

২১৮. বাজসনেয় সংহিতা—রামমোহন রায় ॥ ১৭৬৫ শক । পৃষ্ঠা-১৪

*২ ৯. মানময়ী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ?—? । পৃষ্ঠা—১২

২২০ বঙ্গদেশে যেরূপে—লেখক অজ্ঞাত ॥ ১৭৯৭ শক । পৃষ্ঠা-৯

২২১. প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে—রাজনারায়ণ ॥ ১৭৯৪ শক । পৃষ্ঠা-১১

২২২. বৃত্ত রত্নাবলী—চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা-১৫

*২২৩. রাজধর্ম—রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব ॥ ?—? । পৃষ্ঠা-১৪

২২৪. ধর্মবিবেচনা—লেখক অজ্ঞাত ॥ পৃষ্ঠা-১৫

২২৫. তুলসীমাল্য ধারণ মীমাংসা—রঙ্গাচারি স্বামী। ১২৭০ সাল। পৃষ্ঠা-১১
২২৬. প্রার্থনা বিরোধীদের আপত্তিখণ্ডন—ঠাকুরদাস সেন ॥ ১৭৮৪ শক। পৃষ্ঠা-১১
২২৭. কাশী পঞ্জিকা—লেখক অজ্ঞাত। ১২৮০ শাল। পৃষ্ঠা-১৫
২২৮. প্রায়শ্চিত্তান্তে অব্যবহার্যতা বিচার—কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ॥ ১৩০২ সাল। পৃষ্ঠা-১৫
২২৯. চুপীর দেওয়ান মহাশয়—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৫
*২৩০. শ্রীশ্রীহরি পবিত্রাত্মা—শ্রীনাথ ঘোষ ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৬
২৩১. অবোধ প্রবোধ—মহেশচন্দ্র রায় ॥ ১২৯৮ সাল। পৃষ্ঠা-১৬
২৩২. জাতীয় সম্মিলনী সঙ্গীত—সানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ?—১৮৯০। পৃষ্ঠা-৯
২৩৩. সূক্ষ্ম কালিকথা—বরদাদাস বসু ॥ ?—১৮৯২। পৃষ্ঠা-১১
২৩৪. পঞ্জিকা সংস্কার···—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৯৩। পৃষ্ঠা-৮
২৩৫. সীতা সমরশায়িনী—যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি ॥ ?—১৮৯৯। পৃষ্ঠা-৩
২৩৬. শ্রীকৃষ্ণলীলারসসার—লেখক অজ্ঞাত ॥ ১২৮৮ সাল। পৃষ্ঠা-৮
*২৩৭. একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ?—? ॥ পৃষ্ঠা-১৫
২৩৮. প্রবন্ধমালা (১ম)—হিরালাল দাস ॥ ১৭৮৪ শক। পৃষ্ঠা-১২
+২৩৯. মানকুঞ্জ—লেখক অজ্ঞাত ॥ ১২৯০ সাল। পৃষ্ঠা-১৬
২৪০. গৌরীগীতিকা—লেখক অজ্ঞাত ॥ ১২৮৯ সাল। পৃষ্ঠা-১১
*২৪১. অসতী বিধবার···—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৫
*২৪২. হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-৭
২৪৩. আধ্যাত্মিক পটল—বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য ॥ ?—১৮৯১। পৃষ্ঠা-৯
*২৪৪. বর্ষাণ—লেখন অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-৯
২৪৫. বিজয়া—কৃষ্ণলাল সরকার। ?—১২৮৬ সাল। পৃষ্ঠা-১২
*২৪৬. বসন্তে বসন্ত—অমৃতলাল গুপ্ত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৬
২৪৭. ত্রিদিব ; ষষ্ঠ বা রাগপ্রকাশ—সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ ?—১২৮৭ সাল। পৃষ্ঠা-১২
২৪৮. ভারতমাতা—কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ॥ ?—১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৪
*২৪৯. স্বর্গারোহণ—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১০
২৫০. এই কি সেই ভারত—নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ?—১২৮২ সাল। পৃষ্ঠা-৭
+২৫১. কি ভয়ানক—চন্দ্রকান্ত রায় ॥ ?—১২৭৯ সাল। পৃষ্ঠা-১৬
+২৫২. দুর্গোৎসব—ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ॥ ?—১৮৯১। পৃষ্ঠা-১২
+২৫৩. মধুর চুম্বন—লেখক অজ্ঞাত ॥ ?—১৮৮৪। পৃষ্ঠা-১৮

+২৫৪. হায় কি সর্বনাশ -দ্বারকানাথ মিত্র। ?—১৮৯১। পৃষ্ঠা-১৮

২৫৫. জননী আমার—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—১২৭৯ সাল। পৃষ্ঠা ১১

*২৫৬. রমণী—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১২

২৫৭. মহারাণী—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৬

*২৫৮. একজিবীশন বর্ণন—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—?। পৃষ্ঠা-১৯

২৫৯. সুরেন্দ্রবিজয়—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—১২৯০ সাল। পৃষ্ঠা-১২

+২৬০. বড় মজার কথা—জামালউদ্দিন॥ ?—১২৯৩ সাল। পৃষ্ঠা-১০

২৬১. হরিকীর্ত্তন—তারাব্রহ্মকথক চূড়ামণি। ?—১২৯২ সাল। পৃষ্ঠা-১১

২৬২. মদনমোহন জীউর নিগূঢ় তত্ত্ব—বিপিনবিহারী বন্দোপাধ্যায়। ?—১২৯৬ সাল। পৃষ্ঠা-১৬

২৬৩. হরগৌরী মিলন—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—১২৯০ সাল। পৃষ্ঠা-১৩

২৬৪. আগমনী—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—১২৮৭ সাল। পৃষ্ঠা-৬

২৬৫. বিজয়া—লেখক অজ্ঞাত॥ ?—১২৮৭ সাল॥ পৃষ্ঠা-৭

+২৬৬. সঙ্গীত লহরী—অবিনাশচন্দ্র মিত্র॥ ?—১২৮৬ সাল। পৃষ্ঠা-১৬

+২৬৭. নারীর বোলকল—নন্দ মুন্সী॥ ?—১৮৮২। পৃষ্ঠা-১৬

সামান্য কিছু বইয়ের তালিকা দেওয়া হলো। আরও প্রচুর ক্ষীণায়তন (১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে) বই উনিশ শতাব্দীতে মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকটি এমন বই তালিকাভুক্ত হয়েছে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬-এর সামান্য দুই-এক পৃষ্ঠা বেশি। অসতর্কিত অবস্থায় বইগুলির নাম তালিকায় প্রবিষ্ট হলেও পরে কাটতে গিয়ে মায়া লাগলো। মহাকাল তো এইসব বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের তো বিতাড়িত করেছেনই; সামান্য অসতর্কতার মধ্যে তারা যদি একটু বেঁচে থাকবার সুযোগ পান, তাতে ক্ষতি কী? দুই-এক পৃষ্ঠা বেশি লেখা কি তাঁদের অপরাধ?

খ. বিশ শতাব্দীর কয়েকটি পথ-পুস্তিকার প্রসঙ্গ

বিশ শতাব্দীর কয়েকটি পথ-পুস্তিকা থেকে কিছু রচনার নিদর্শন তুলে দিলাম। গত দশ বছরের মধ্যে এগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।—

॥ গদির গ্যাড়াকল—নিত্যগোপাল রায়॥

"(গান) আধুনিক সুর

এমন মোদের দেশ হয়েছে আহারে দুঃখের সীমা নাই

সারাদিন উপোষ করে বিকেলে জবের রুটি খাই॥

চালের দাম বেড়ে গেল দেখে,
ভুট্টার খিচুরী খায় অনেকে।
এ দুঃখ কার কাছে জানাই—
গদী নিয়ে লড়াই বেধে গেল
কত লোক অকালে প্রাণ দিল।
এখন বলো কোথায় মোরা যাই—"

একই পুস্তিকায় আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে একটি তিন অঙ্কের দৃশ্য সম্বলিত নাটক! তাতে আবার সঙ্গীতও আছে। নাট্যাংশের নমুনা দিই।—

"২য় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

কাঁচাগোল্লা বাহির বাটি বসিয়া পত্রিকা পড়িতেছিল, হঠাৎ কাঁচাকলা ও কানা বেগুনের প্রবেশ।

কাঁচাকলা—দোহাই বন্ধুবর আমাদের থাকিবার স্থান দিন।

কাঁচাগোল্লা—কে ও আপনি আসুন আসুন আপনারা গদি থেকে চলে যাওয়ার পর মনটা খুবই খারাপ।

কানা বেগুন—দেখুন ভোটের পর থেকে অনেক দিন বিদেশে ঘুরছি, আর পারি না এবার মনে করেছি আপনার সঙ্গে যুক্তি করে অধর্মরাজের কাছে যাব।"—ইত্যাদি।

॥ কালের হাওয়া—ধীরেন মৈত্র ॥

সিনেমা দেবীর প্রণাম :—

"সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে কাননবালা সমাগতা
স্বাগত মধুবালাং কাকু নিম্মি সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে সুরাইয়া সদা সুচিত্রা সেন নমস্ততে।"

এই পুস্তিকায় সিনেমা সংক্রান্ত বাংলা পদ্যে একটি বিশিষ্ট ছন্দ বিন্যাস আছে—যা অনেক পথ-পুস্তিকা-কার গ্রহণ করেছেন। ছন্দের নমুনা,—

"পেটে ভাত জোটে না কি কারখানা দেশটা হল ছাই
হতচ্ছাড়া টকী এসে সংসার করা দায়
টকীর এমনি ধারা
টকীর এমনি ধারা পাগল করা ঘর কুলের ঐ সতী
স্বামী ভক্তি দূরের কথা সন্ধ্যায় না দেয় বাতি

কত চোখের ঠারে

কত চোখের ঠারে পাগল করে কত যুবক মন
ছায়ার মানুষ সজীব প্রাণে দিচ্ছে জ্বালাতন
তখন ওরা বলে
তখন ওরা বলে যাবো চলে বাধা না মানিব
টিকিট বাবুর পয়সাগুলো গহনা বেচে দিব
টকী দেখতে হবে
টকী দেখতে হবে বাধা দিলে বাপের বাড়ী যাবো
তোমায় আমি ডাইভোর্স করে অন্য ঘর করিবো
সে যে আইনে আছে।"—ইত্যাদি।

॥ কোথায় এমন দেশ—শ্রীকুমার পাঠক ॥

একটি কবিতা তুলে ধরছি। সম্পূর্ণ টাই দেওয়া হলো।—

"তোমরা কি চেন ভাই হরিদাস পালকে
দমদম বেলেঘাটা এয় থাকে শালকে।
কেরাণীর কাজ করে কোনও এক অফিসে
কোনও দিনই কোন কিছু করেনিক দাবী সে।
ঝাণ্ডাটি হাতে কভু মিছিলেতে যায় নি
কোনও দিন কোন পার্টির কোনও চাঁদা দেয় নি।
অফিসের বড়বাবু বলে যাহা করতে
হরিবাবু করবে তা হয় যদি মরতে।
কত হল হানাহানি কত বোমা ফাটল
স্বাধীনতা সুরু থেকে কত দিন কাটল।
ঝড়ে জলে হরিবাবু কাজে ঠিক যাচ্ছে
ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে আধপেটা খাচ্ছে।
মুখ ফুটে প্রতিবাদ কোনও দিন করে নি
বাঁচাটাই বড় কথা আজও সে ত মরে নি।
দেশে কেউ হরতাল বন্ধ কেউ ডাকিলে
হরিবাবু অফিসেতে বিছানাটি বগলে।
বলি তারে হরতালে না গেলে কি হয় না?
হরিবাবু বলে যান প্রাণে আর সয় না।

তোমরা কি বন্ধ করবে দেখ গিয়ে বাড়িতে ?
দুই দিন খাওয়া বন্ধ চাল নাই হাড়িতে।
চুলে তেল দেওয়া বন্ধ, দেখ চুল রুক্ষ
ছেলেটা অসুখে পড়ে কে বুঝিবে দুঃখ।
জামা কাপড় কেনা বন্ধ ছেড়া জামা পরেছি
ছেলে মেয়ের লেখাপড়া তাও বন্ধ করেছি।
এক বেলা ভাত বন্ধ সেত কবে হয়েছে।
রুটিটাই বন্ধ হতে বাকি শুধু রয়েছে।
ছেলেটা বেকার বসে কাজ কই পাচ্ছে
কত কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
মাছ খাওয়া সেত ভাই বহু দিন বন্ধ
যদি আসে রাজনীতি তাই মুখ বন্ধ।
সিগারেট বন্ধ করে বিড়িটাকে ধরেছি
বিড়িটাও বন্ধ করে মুস্‌কিলে পড়েছি।
উৎসব বিবাহ বন্ধ কারো বাড়ী যাই না
দুধ ঘী তাও বন্ধ বহুদিন খাই না।
আমি মন্ত্রী হতে পারি নি কেরাণী একজনা
খাদ্য যা খাই পাজরের হাড় দেখ যায় গোনা।
ভয় হয় ফ্যামিলী মেম্বার বেড়ে যায় একজনা
তার আগে মোর ঘুচাও যন্ত্রণা।
বন্ধ সেত প্রতিদিন চলছে ও চলবে
যতদিন এই পাল পটোল না তুলবে।"

কবিতাটির শিরোনাম "হরিদাস পাল"। গৌরী সেনের মতো হরিদাস পালও বাঙালী সমাজে স্বনাম-ধন্য।

॥ মহাকলির শেষলীলা—বিজয়কুমার মণ্ডল ॥

পুস্তিকাটির শেষ কবিতা "মহাকলির শেষ" থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।—

"সপ্ত বরষের নারী যুবতী হইবে
নবম বরষের নারী ছেলে প্রসবিবে॥
এক মায়ের গর্ভে কন্যা অগণিত হবে।
বিয়ে নাহি হবে তার লটারা হইবে॥

এক যুবার পিছু সাত যুবতী ছুটিবে।
ঘেরিয়া সকলে তারা পিরীতি করিবে॥
চৌদ্দ বরষে লোকে বৃদ্ধ যে হইবে।
সতের বরষে সবে ভবপারে যাবে॥
৬ ইঞ্চি মানুষ সবে ধরাধামে হবে।
আকসী বাড়ায়ে সবে বেগুন তুলিবে॥
সেইদিন কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে।
শূন্যমার্গে গুম্ গুম্ শব্দ পড়িবে॥
উড়িষ্যার মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ যে বাধিবে।
জগন্নাথ দ্বারে খিল আপনি পড়িবে॥
বাগবাটী দ্বারে দেবী ছাড়িয়া পালাবে।
কাটামুণ্ড বার বার ডাকিতে লাগিবে॥"—ইত্যাদি।

॥ নারীর আচরণ—কানাইলাল বিশ্বাস ॥

নারীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে প্রচুর পথ-পুস্তিকায় প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আধুনিক নারীরা যে বিপথগামিনী—সেটা দেখাবার চেষ্টাও অনেক পুস্তিকায় আছে। নারীর আচরণ সম্পর্কে এই পথ পুস্তিকাটি থেকে সামান্য অংশ তুলে ধরছি।—

"নারীর আচরণ রেখ স্মরণ কানাইলাল বলি
দরজার সম্মুখে যদি নারী ফেলে কুলি
শিশুর বিছানায় বসে মাতাপিতা খায়
দিনে দিনে ও শিশুর আয়ু কমে যায়
মায়ে যদি ঘুমের শিশু কোলে লয়ে খায়
স্নানাদি করে নারী মুখে জল দিবে
ভাগ্যবতী সেই নারী লক্ষ্মীর সমান হবে
ভিজা কাপড় যদি নারী রৌদ্রে শুকাইতে দেয়
বেলা থাকতে নেয় না ঘরে পেচার দৃষ্টি হয়
চুল ছাড়িয়া পা মেলিয়া বসে নিরালায়
লক্ষ্মী তাই দূরের কথা অলক্ষ্মীতে পায়।"—ইত্যাদি।

॥ স্বামী সেবা—বিবি দোলনী খাতুন ॥

কভারে একটি পদ্য আছে,—

"স্বামীই পরম ধন শুধু অবলার,

লিখিয়া ভগিনী-করে দিনু উপহার।
দৃশ্যমান দেব স্বামী অবলার প্রাণ,
কায়মনে কর সেবা চাও যদি ত্রাণ।"

গ্রন্থের মধ্যেও সেই স্বামী সেবার কথা,—

"রমণী রতনে স্বামী হইলে বেজার
ধর্ম কর্ম সব মিথ্যা জীবন অসার।
স্বামী ধর্ম স্বামীকর্ম, স্বামী অলঙ্কার
বসনে ভূষণে জেনো স্বামী মূলাধার॥
নয়নের দুটী তারা জেনো, স্বামী জ্যোতি,
খাইতে শুইতে জেনো স্বামীর শকতি।
হৃদি-স্বরে উঠে যত আনন্দের ধার,
স্বামীর স্মরণে তাহে জেনো সবাকার॥"—ইত্যাদি।

॥ বিয়ের ছড়া—অর্ধচন্দ্র শোয়েরী ॥

প্রথম কবিতা বা "অভিবাদন" :—

"নাই ভারতে এমন মিলন বিয়ের মিলন সম,
প্রিয়তমে, প্রিয়তমা, প্রিয়তম মম।
নাই ভারতে এমন বাড়ী বিয়ের বাড়ীর সম,
প্রিয়তমে, প্রিয়তমা, প্রিয়তম মম।
নাই ভারতে এমন ঘর বাসর ঘরের সম,
প্রিয়তমে, প্রিয়তমা, প্রিয়তম মম।
নাই ভারতে এমন রঙ্গ বিয়ের রঙ্গ সম,
প্রিয়তমে, প্রিয়তমা, প্রিয়তম মম।"

"বরের উদ্দেশ্যে দিদিমার হেঁয়ালী ছড়ার" নমুনা—

১. "পুরুষের পেটে পুত্রের জন্ম
২. মেয়ের গজালো দাড়ী।
এ ছড়া না বলতে পার তো
নাক কেটে নিতে পারি।"

(উত্তর—১. পুরুষের পুত্র, বাঁড়া তাল গাছের মোচা
২. মাদী ছাগলের দাড়ী।)

"বরের ছড়া হেঁয়ালীর" নমুনা :—

৩. "শুয়ে শুয়ে দেয় না গো সে, দেয়না বসে বসে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয় তো দেয় হাট বাজারের পাশে ॥
মনের মত দেয় তো দেয় পোড়া বাড়ীর কোণে
ভাল করে দেয় তো দেয় উলু খাগ্‌ড়ার বনে ॥"

(উত্তর—৩. কুকুরের প্রস্রাব)

পথ-পুস্তিকাটির আরম্ভ এবং শেষ পরিণতি লক্ষ্য করুন।

॥ কালিদাসের হেঁয়ালী—কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥

"প্রশ্ন ৩. একটুখানি ঘরে চুনকাম করে
এমন মিস্ত্রী নাই, যে ভেঙ্গে গড়ে।" (ডিম)

"প্রশ্ন ৪. হাসতে হাসতে আসছো তুমি ঠাট্টা করতে মোকে
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার শ্বশুরের মাকে
ভেবে দেখো মোর সনে কি সম্বন্ধ হয়
উপহাসের পাত্রী কিনা জানিবে নিশ্চয়।" (জামাই-শাশুড়ী)

॥ দেশকে বাঁচাও—শ্রীকুমার পাঠক ॥

রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি 'লালিকা'র (প্যারডি) উদ্ধৃতি দিচ্ছি।—

"টাকা চাই
যদিও শান্তি নাহিকো আমার এ অন্তরে
হৃৎপিণ্ডটা মাঝে মাঝে যায় থামিয়া
যদিও খরচা দিয়েছি অনেক কম করে
তবু মাঝে মাঝে উঠছি নিজেই ঘামিয়া
মহা আশঙ্কা দিয়েছে দেখা এ সংসারে
মানুষের মত যায় না বাঁচিয়া থাকা
তবু হে বন্ধু ওরে ও বন্ধু মোর
বাঁচিতে হলে টাকা চাই আরও টাকা।"

অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত পথ-পুস্তিকার রসিকসমাজের মনে বলা বাহুল্য 'টাকা' সম্পর্কিত এই কবিতা নিশ্চয়ই আবেদন সৃষ্টি করবে। 'টাকা' নিয়ে অনেক পথ-পুস্তিকাতেই বিভিন্ন ধরনের কবিতা আছে।

॥ কলির বৌ—বেণুপদ দে ॥

পথ-পুস্তিকাটির আরম্ভ এভাবে হয়েছে,—

"শুনুন বন্ধুগণে একমনে শুনুন দিয়া মন,
আধুনিক ষ্টাইলের কথা করে যাই বর্ণন।
ঐ যে কলিকাতা ২ নয়কো যাতা সহর অঞ্চল,
সেখানে হচ্ছে ভাইরে আজব গ্যাডাকল।
কত ষ্টাইলের ছেলে ২ যাচ্ছে চলে সিনেমার ঐ হলে,
বই হাতে নিয়ে বাবু প্রেমিকা নিয়ে চলে।
বাবুর কোর্ট কো ১ স্যুট ২ পায়ে বুট হাতে ঘড়ি আছে
কলেজে পড়ে অষ্টরম্ভা শুধু মেয়ে চাটা।"—ইত্যাদি।

পথ-পুস্তিকার লক্ষণশীলতার কথা আগেই বলেছি। কলেজীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রসিক সমাজের কাছে এই জাতীয় কবিতার নিশ্চয়ই আবেদন আছে।

॥ অফুরন্ত ভালবাসা—জেহের উদ্দীন মোল্লা ॥

মলাটে পদ্য :—

"ভাটা পানি উজান ধায়
বুড়া মানুষ পাগল হয়।"

কাহিনী বর্ণনার ধাঁচ এরকম :—

"তাহার তিন পুত্র ২ শুনামাত্র উঠিল গর্জিয়া,
বাপে তৈরী ছেলে ভগ্নী করিতে চায় বিয়া।
পড়া বন্ধ করে ২ রাখে ঘরে যাইতে না দেয় বাহিরে
সুফী এখন ঘরের ভিতর খালি চিন্তা করে।
ছেলে ঠিক করিল ২ দিন পড়িল বারে শুক্রবারে
চিন্তায় ২ সুফীর শরীর কিছু নাহি আর।
বাড়ীর চাকর ছিল ২ ঠিক করিল ১০ টাকা দিয়া
পত্রখানা দিয়া আইল অতি ব্যস্ত হইয়া।
তাতে লেখা ছিল ২ গেল দেখা বিয়া শুক্রবারে
আগের দিন রাত ১২ টায় আসবে তুমি চলে।"—ইত্যাদি

এই কাহিনী পড়ে "বুড়া মানুষ" কখনো পাগল হয়েছে কিনা জানা নেই তবে রসিক সমাজ তৃপ্তি পেয়েছে ঠিকই।

(পথ-পুস্তিকার মধ্যে সংখ্যাপ্রীতি রক্ষণশীলতারই বৈশিষ্ট্য।)

॥ বিয়ে যদি করতে হয়, সহর থেকে দূরে—জেহের উদ্দীন মোল্লা ॥

পয়সা-প্রশস্তির একটি গান :—

> "পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে
> পয়সার জন্য গণ-মান্য কেউ করে না জগতে।
> পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে,
> পয়সা আছে যার ঘরে খাটায় সুদের কারবারে।
> লঙ্কা পোড়ায় বাড়ছে ভুড়ি দুধে কি করে,
> তারা পয়সার জোরে মানুষ মেরে খালাস পায় আদালতে,
> পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে
> পুরুষের পয়সা হীন হলে ঘরের বৌটা কি বলে।
> তোর পাল্লায় পড়ে আমার হাড় গেল জ্বলে,
> তোরে দেখলে আত্মা যায় রে জ্বলে।
> ঝাটা মারতে হয় তোর মুখেতে,
> পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে।"—ইত্যাদি।

কবিতাটির মধ্যে রসিকবর্গ তাদের ক্ষেদের মনের কথাই খুঁজে পাবেন।

উদ্ধৃতি প্রচুর দেওয়া যায় বিভিন্ন পথ-পুস্তিকা থেকে। এবারে অন্য প্রসঙ্গে আসি। পথ-পুস্তিকার যেগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় কাহিনী আছে, সেগুলির নামকরণের গতিবিধি দেখাবার জন্য কয়েকটি পথ-পুস্তিকার নাম উল্লেখ করছি।—

১. জামাইবাড়ী শ্বশুরের ডাকাতি (—বড় হরফে লেখা) বাবাকে জেলে দিয়া কি রূপেতে স্বামীর প্রাণ বাঁচায় (—মাঝারি হরফে লেখা)—জেহের উদ্দিন মোল্লা।

২. ১৮ই জুন মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে (—মাঝারি হরফে লেখা) নারীর হাতে ট্যাক্সী ড্রাইভার ডাকাত জব্দ (—বড় হরফে লেখা) —প্রবীণকুমার রায়।

৩. সতী নুরজাহানের ইজ্জত নষ্ট (মাঝারি হরফে লেখা) মহাপাপীর সাক্ষী (—বড় হরফে লেখা)—জেহের উদ্দীন মোল্লা।

৪. মরা ছেলের বিয়ে (—বড় হরফে লেখা) কিরূপে প্রাণ বাঁচাল (সাধারণ হরফে লেখা) তাহার বিবরণ (মাঝারি হরফে লেখা) —মহাদেবচন্দ্র সাহ

৫. ১২ দিনের ছেলের সঙ্গে ১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ (মাঝারি হরফে লেখা) রূপবান কন্যার (বড় হরফে লেখা) কবিতা (মাঝারি হরফে লেখা)—মনসুর আলি মোল্লা।

৬. ছেলের মাংস কেটে রন্ধন। বড় হরফে লেখা) সতীনের ছেলেকে কেটে মাংস খেতে দেয় স্বামীকে (মাঝারি হরফে লেখা)—প্রবীণকুমার রায়।

এই ছয়টি বইয়ের ব্লকগুলি দেখা যাক। এগুলি প্রচ্ছদের (?) ওপরে মুদ্রিত।

১. আয়নার সামনে একটি পূর্ণাবয়ব মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। (বিজ্ঞাপনে যা ব্যবহার করা হয়)

২. একটি মোটর গাড়ীর ব্লক। বিজ্ঞাপনের ব্লক।

৩. একটি কাকের ব্লক (স্কুলপাঠ্য বইয়ের) এবং একটি মেয়ের মুখের পৃথক ব্লক (প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ব্লক)

৪. একটা সাপের ছবি পাঠ্যপুস্তকের ব্লক) এবং পৃথক একটা ব্লক,—নাচের ঢংএ একটি পূর্ণাবয়ব মেয়ে (বিজ্ঞাপনের অথবা বিয়ের পদ্য ছাপার জন্য ছাপাখানার স্টকে রাখা ব্লক)

৫. সন্তান কোলে একটি নারীর ছবি (নির্ঘাত পাঠ্যপুস্তকের ব্লক)

৬ একটি মেয়ের রান্না করা। ছবি (এটিও পাঠ্যপুস্তকের ব্লক বলে মনে হয়)

রেডিমেড্ ব্লক ব্যবহার পথ-পুস্তিকার প্রসাধনে একটি বৈশিষ্ট্য।

সবশেষে পথ-পুস্তিকার দুটি জনপ্রিয় পদ্য উদ্ধৃত করবার ইচ্ছা জাগছে। প্রথমটি "ভালো নয়" পদ্য। পদ্যটি অনেক পথ-পুস্তিকাতেই আছে, তবে বক্তব্যে কিছু কিছু পরিবর্তনও আছে। একটি দৃষ্টান্ত (আংশিক),—

"ভাল নয়—মিথ্যা কথায় নিজ দোষ ঢাকা
ভাল নয়—স্বামীস্ত্রীতে সর্বদাই থাকা।

ভাল নয়—কুল নারীর নাটক নভেল পড়া,
ভাল নয়—কুল বধূর গান বাজনা করা।"—ইত্যাদি।

রেলের কামরায় পথ-পুস্তিকার এখন ভালো বাজার। তাই কবির মন্তব্য,—

"ভাল নয়—বিনা টিকিটে রেলগাড়ীতে চড়া।"

এর মধ্য দিয়ে 'মামা'কেও তোষামোদ করা হয় বইকি।

আর একটি পদ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। এটি হলো আহম্মক নির্ণয়। সম্পূর্ণ পদ্যটিই তুলে ধরছি—যদিও বিভিন্ন পুস্তিকায় যথেষ্ট পাঠান্তরও আছে। কারণ আহম্মক নির্ণয়ে কবির স্বাধীনতা আছে।

"আহম্মক এক—
যেজন রাস্তায় চলতে খালি রাখে ট্যাঁক
আহম্মক দুই—
যেজন সখ করে চালে তোলে পুঁই

আহম্মক তিন—

যেজন ছোট লোকের কাছে করে ঋণ

আহম্মক চার—

যেজন স্ত্রীর কথায় মাকে দেয় মার

আহম্মক পাঁচ—

যেজন পরের পুকুরে ছাড়ে মাছ

আহম্মক ছয়—

যেজন ঘর জামাতা শ্বশুরবাড়ী রয়

আহম্মক সাত—

গিন্নির সঙ্গে ঝগড়া করে যে খায় না ভাত

আহম্মক আট—

ধানের জমি বেচে যে করে শোবার খাট

আহম্মক নয়—

যেজন ঘরের কথা পরের কাছে কয়

আহম্মক দশ—

যেজন সর্বদাই গিন্নির কথায় বশ ॥"

রসিক সমাজের কেউ আহম্মক কিনা, সে বিচারের ভার তাঁদের নিজেদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকা

পরিশিষ্ট অংশের নির্দেশিকা বাহুল্যবোধে বর্জন করা হয়েছে। নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছেন কল্যানীয়া শ্রীমতী নমিতা ফদিকার।